নরবাঁধ

মাথুর

শ্রীমনোজ বসু

রসচক্র সাহিত্য সংসদ,
দক্ষিণ কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীকালিদাস রায়
রসচক্র-সাহিত্যসংসদ্
১৫,রাজা বসন্ত রায় রোড,
কলিকাতা

দাম দেড় টাকা

প্রথম সংস্করণ
চৈত্র—১৩৪০

নরবাঁধ

এই লেখকের লেখা—

বনমর্ম্মর

বাংলা সাহিত্যের চিরস্মরণীয় বই

এই একখানা মাত্র বই লেখককে অভাবনীয়
গৌরব দান করেছে। আধুনিক কালে
এমন সৌভাগ্য আর কারো হয় নি।
দাম এক টাকা বারো আনা।

পরিচয়—যে retrospect, চিন্তার গভীরতা এবং মনের বেদনা-বোধ থাকিলে লেখা চিরন্তনের পর্য্যায়ে গিয়া পৌছায় তাহা মনোজ বসুর আছে।

প্রবাসী—বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের নদীমাঠবনের ছবি প্রবাসী বাঙালীকে home sick ক'রে তুলবে।

বিচিত্রা—সরল, অকৃত্রিম ও অনাড়ম্বর জীবনের সহস্র দুর্ব্বলতা, অতি সাধারণ জীবন-যাত্রার অতি তুচ্ছ ঘটনাবলী ও অতি সামান্য অনুভূতিগুলি লেখকের প্রাণের গভীর দরদের রাসায়নিক ক্রিয়ায় অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে।

নবশক্তি—অত্যন্ত ছোট চরিত্রকেও অল্প কথায় এমন চমৎকার ফুটাইয়া তুলিতে যিনি পারেন, তিনি যে সুদক্ষ কথাশিল্পী এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

ইত্যাদি

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

১৫ই চৈত্র, ১৩৪০ শ্রীমনোজ বসু

ঘর-বাঁধা

ছোটকাকার বিয়েতে বরযাত্রী হইয়া চলিয়াছিলাম। তিন ক্রোশ পথ পায়ে হাঁটিয়া কানাইডাঙার ঘাটে নৌকা চাপিতে হইবে।

সে আজিকার কথা নয়, তখন বয়স আমার নয় কি দশ। এই উপলক্ষে বেগুনী রঙের ছিটের জামা এবং একজোড়া মোজা-জুতা কেনা হইয়াছে। সেই নূতন জামা গায়ে দিয়া অতি সন্তর্পণে পথ চলিতেছি, ধুলা না লাগে। আর-আর ছেলেরা যাইতেছিল, তাহাদের বেগুনী জামা নাই—অনুকম্পার সহিত মাঝে মাঝে তাহাদিগকে তাকাইয়া দেখিতেছি। মেঠো পথে খারাপ হইয়া যাইবার আশঙ্কায় জুতাজোড়া পরিতে মন সরে নাই, খবরের কাগজে জড়াইয়া বগলে লইয়াছি। বরের পাল্কী ও বাজনদার আগে আগে চলিয়া গিয়াছে, পিছনে পড়িয়া আমরা। ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। ডোঙাঘাটা ছাড়াইলাম, তারপর সাগরদত্তকাটী গ্রামের খেজুর বন, তারপর ভাঙা মসজিদ, সারি সারি তিনটা তেঁতুলগাছ, শেষে কুমোরপাড়ার বড় বাঁশবাগানটা পার হইয়া একেবারে ফাঁকা বিলের মধ্যে।

ধানের সময়। ধানবন একেবারে [illegible] গাছপালার গোড়া অবধি চলিয়া গিয়াছে, ধানের গোছায় কোনখানে বিলের জল দেখিবার উপায় নাই। আর দেখিলাম, তেপান্তর ভেদ করিয়া উত্তর-দক্ষিণে সোজাসুজি সারবন্দী চলিয়া গিয়াছে বড় বড় শিরীষ গাছ। বিলের মধ্যে অমন করিয়া গাছ পুঁতিয়া রাখিয়াছে কে? বড় আশ্চর্য্য লাগিল।

দ্বারিক দত্ত গ্রাম-সম্পর্কে ঠাকুরদাদা, বুড়া লাঠি ঠক-ঠক করিয়া

পাশে পাশে যাইতেছিলেন। কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁর কহিলেন—শুধু কি গাছ? এইটুকু এগিয়ে আয়—দেখ্‌বি কত্তো বড় রাস্তা। বৈকুণ্ঠ রায়ের রাস্তার নাম শুনিস নি?

নামটা বরাবরই শুনিয়া থাকি, সেই রাস্তার উপর দিয়া তবে আজ যাইতে হইবে!

রাস্তার উপর গিয়া যখন উঠিলাম, বিস্তার দেখিয়া সত্যসত্যই তাক লাগিয়া গেল। দত্ত-বুড়াকে পুনরায় কি একটা প্রশ্ন করিতে যাইতে-ছিলাম, কিন্তু দেখি হাতের লাঠিটা ফেলিয়া একটা শিরীষগাছের গোড়ায় বসিয়া পড়িয়া ইতিমধ্যেই তিনি ভাবে গদ-গদ হইয়াছেন। বলিতে লাগিলেন—দেখেছ ভায়ারা, লক্ষ্মী-ঠাকরুণের দয়াটা একবার দেখ—। মরি মরি—যেন দু'হাতে ঢেলেছেন।···এই পুঁটীমারীর বিলে আমার লাখেরাজ ছিল আড়াই বিঘে—সে কি আজকের?—রূপচাঁদ রায়ের দত্ত দেবোত্তর। নিবারণ চক্কোত্তি তাঁহা ফাঁকি দিয়ে নিলে! ওর ভাল হবে কখনো?

মন্মথচরণ কহিল—আবার বসে' পড়লেন কেন দত্ত মশায়, চলুন —চলুন—জায়গা খারাপ, আঁধার না হ'তে এইটুকু পার হ'তে হবে—

দত্ত মহাশয় আঙুল দিয়া আর একটা গাছের গোড়া নির্দেশ করিয়া কহিলেন—ও মন্মথ, তুমিও একটুখানি বসে' নাও না! ছোট ছোট ছেলেপিলে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, না জিরিয়ে নিলে ওদের হাঁপ

পরে যাবে যে—। বলিয়া বুড়া নিজেই প্রবল বেগে হাঁপাইতে লাগিলেন।

কিন্তু সকলে সমস্বরে না—না—করিয়া দত্তের প্রস্তাবটা উড়াইয়া দিল।—সে কি করে' হবে? নর-বাঁধ পার না হ'য়ে বসাবসি নেই! লাখ টাকা দিলেও রাত্তির কালে অশ্বত্থতলা দিয়ে যাওয়া যাবে না। তাড়াতাড়ি হেঁটে চলুন মশাইরা সব—তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি—আরো।

ফলে উল্টা উৎপত্তি হইল। বিশ্রাম ত পড়িয়া মরুক, ইহার পর যে কাণ্ড আরম্ভ হইল তাহাকে হাঁটিয়া যাওয়া কোনক্রমে বলা চলে না। ছোট বড় গুণতি করিয়া আমাদের দলে বরযাত্রী জন চল্লিশের কম হইবে না। এবার একা দ্বারিক দত্ত নয়, সকলেই দস্তুরমতো হাঁপাইতে লাগিল।

হরি জেঠা আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। বলিলেন—শিবু, আর একটু—উই যে সামনে মস্ত উঁচু-মাথা অশ্বত্থগাছ— ঐ-ঐ—ঐখানে। নর-বাঁধটা পার হয়ে আস্তে আস্তে চলবো। আমার কান্না পাইতেছিল। বলিলাম—আর কতদূর? জেঠা বলিলেন—কানাই-ডাঙা? পথ আর বেশী নেই, নর-বাঁধের পর বাঁয়ে একটা ডাঙাড়—সেইটে দিয়ে রসিটাক এগুলে গাঙ পড়বে।

সন্ধ্যার আগেই বড় একটা খালের ধারে পৌছান গেল। জেঠা বলিলেন—এই নর-বাঁধ। এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখি, বাঁধের চিহ্ন

কোন দিকে কিছু নাই, কেবল খালটা মাত্র। লাখ টাকা দিলেও রাত্রিবেলা ওর অশ্বত্থতলা দিয়া এই চল্লিশটা মানুষ একসঙ্গে যাইতে স্বীকার করিবে না সেই গাছটি দেখিলাম। কেন যে সকলের এত ভয় ডাল-পালা মেলানো সুপ্রাচীন গাছের চেহারা দেখিলে তাহা তৎক্ষণাৎ বোঝা যায়। আমার ত সেই দিনের বেলাতেই গা ছম-ছম করিতে লাগিল।

সকলে কাপড় জামা খুলিয়া পুঁটলী বাঁধিয়া লইল। আমি হরি জেঠার কাঁধে চড়িলাম এবং আমার কাঁধে কাগজে-মোড়া সেই নূতন জুতাজোড়া। জিজ্ঞাসা করিলাম—জেঠা, বাঁধ কই? দুই ধারে বাঁশের খোঁটা পোঁতা, তাহার মধ্য দিয়া জল ভাঙিয়া সকলে চলিয়াছে। সেই বাঁশ দেখাইয়া জেঠা কহিলেন—বাঁধ ভেসে গেছে বর্ষার টানে, বাঁশগুলো আছে—আবার মাঘ মাসে জল কম্‌লে চাষীরা নতুন করে বেঁধে দেবে—

কে একজন পিছনে আসিতেছিল, তাহার নামটা মনে নাই, কহিল—চাষা বেটাদের বুদ্ধি দেখ না—ফি বছর এই রকম গতর ঘামিয়ে পয়সা খরচ করে' বাঁধ বাঁধবে,—তার চেয়ে একবার এক পাঁজা ইঁট পুড়িয়ে যদি দুইধার পাকা করে' বেঁধে দেয়—ব্যস!

দ্বারিক দত্ত কোথায় ছিলেন, হঠাৎ দেখি জলের মধ্যে লাঠি খোঁচাইতে খোঁচাইতে কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন। বলিলেন—কি ব'ল্লে, পাকা ইটের গাঁথনী হলেই বাঁধ টিকে থাকবে? সে আর হ'তে হয় না।

বল্লভ রায়ের টাকা তো কম ছিল না বাপু—পারলে না কেন? টাকাতে এ হয় না। একটা নরবলি দিয়ে এইটুকু চড়া পড়েছে—সহস্র নরবলি হ'লে তবে যদি মা কালী খুসী হ'য়ে খাল ভরাট করে' দেন—

ভয়ে সর্ব্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। এইখানে মানুষ বলি হইয়াছিল নাকি? আবার হয়ত অনাগত দিবসে কে কবে আসিয়া সহস্র বলি দিয়া আগাগোড়া খাল ভরাট করিয়া দিবে! জল বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে হরি জেঠার বুক অবধি তলাইয়া গেল। আমি চুপটি করিয়া কাঁধের উপর বসিয়া আছি। দ্বারিক দত্তের উদ্দেশে প্রশ্ন করিলাম—ও বুড়ো দাদা, এখানে নরবলি হয়েছিল নাকি?

দ্বারিক দত্ত উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হরি জেঠার বোধ করি মনে মনে ভয় হইয়াছিল। হঠাৎ বিরক্তভাবে প্রসঙ্গ থামাইয়া দিলেন—বক্-বক্ কোরো না শিবু, শক্ত করে' ধরে' বোসো—

তখন হইল না, কিন্তু সেই দিনই রাত্রিবেলা গল্পটা শুনিয়াছিলাম। পানসীতে উঠিয়া বরযাত্রী-দলের ভয় কাটিয়া মুখ আবার প্রসন্ন হইল। দুই জোড়া পাশা পড়িল এবং তাহার উৎসাহ ও চীৎকার উদ্দাম হইয়া ক্ষণে ক্ষণে নদীর বুক কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল। কেবল দ্বারিক দত্ত মহাশয় দল-ছাড়া; পাশা খেলা জানেন না—বৃথাই চুল পাকাইয়াছেন। একাকী গলুয়ের উপর বসিয়া ছিলেন। আমি কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিলাম—বুড়ো দাদা, গল্প বলো—।

—গল্প? কিসের গল্প শুন্‌বি?

বলিলাম—ঐ নর-বাঁধের—

হাতে কাজ নাই, দ্বারিক দত্ত তখনই প্রস্তুত। আরম্ভ করিলেন —তবে শোন্—

পুঁটিমারীর বিল হইতে ক্রোশ সাতেক দক্ষিণে এখন সেখানটা ভদ্রা নদী গ্রাস করিয়াছে, কেবল কতকগুলি অনেক কালের বড় বড় ঝাউগাছ নদীতীর আঁধার করিয়া দাড়াইয়া আছে। ঐখানে বল্লভ রায় মহাশয়ের বাড়ী ছিল। ঢাকার নবাব-সরকারে চাকরী করিতেন, নবাবের ভারী বিশ্বাস তাঁহার উপর। দেউড়ীর কাছে একখানা প্রকাণ্ড সেগুন কাঠ পড়িয়া ছিল, তেমন কাঠ আজকালকার দিনে ভূভারতে কোথাও হয় না। বল্লভ একদিন কাঠখানা চাহিয়া বসিলেন।

নবাব ঐপথে সর্ব্বদা আসিতেন যাইতেন। কিন্তু নবাব-বাদশার ত নীচের দিকে তাকাইবার নিয়ম নাই, কাজেই খেয়াল ছিল না। প্রশ্ন করিলেন—কিসের কাঠ? কত বড়?

বল্লভ দুই হাত আন্দাজী আয়তন দেখাইলেন এবং বলিলেন—
...ড়ে বাঁধবার ইচ্ছে করছি, সেই জন্য।
...ল। নবাবের বারো হাতী লাগাইয়া তবে
...তে হয়। তারপর বড় ভাউলের সঙ্গে বাঁধিয়া
...ল। ঐ এক কাঠে বল্লভের তিন মহল বাড়ীর
...ছিল। যাঁহারা রায় মহাশয়ের বড় অন্তরঙ্গ
...পনে আর একটা কথা বলিতেন—বল্লভ নাকি
নবাবের তোষাখানা হইতে সরাইয়া ঐ ভাউলের
...আনিয়াছিলেন। সত্য মিথ্যা সেই স্বর্গীয়েরাই
...পর বল্লভ রায় আর ঢাকায় ফিরিয়া যান নাই।
... দিয়া একেবারে ভৈরব অবধি জায়গা-জমি
...কুড়িয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। ঘাঁটিতে
...া ঢালির দল ঢাল সড়কী লইয়া পাহারা দিত।
নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয় দাস। অমন খেলোয়াড় আর
এ অঞ্চলের লাঠিয়ালেরা লাঠি ধরিবার আগে
মৃত্যুঞ্জয়ের নামে মাটী হইতে ধূলা তুলিয়া মাথায় ও কপালে মাখিয়া থাকে।

শোনা যায় মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ী ছিল পূব অঞ্চলে পদ্মাপারে। যৌবনে খুন ডাকাতি দাঙ্গা করিয়া খুব নাম কিনিয়াছিল, তারপর বয়স ভারী হইলে নিজেই ডাকাতির দল গড়িল। কিন্তু বউ মরিয়া যাইবার

পর যেন কি হইল। আঁতুড় ঘরে বউ [illegible] চিয়া উঠিল—ক্রমে সে বছর পাঁচেকের হইল, স [illegible] ত। সেই কুড়োনকে লইয়া মৃত্যুঞ্জয় শান্ত ভা [illegible] ল। বড় ছেলের নাম যাদব, তাহাকে ফিরাইতে [illegible]— কিন্তু যাদবের নূতন বয়স, রক্ত গরম—বা [illegible] লে রহিয়া গেল।

কিন্তু ঘর কন্না কপালে ঘটে নাই।

বয়সকালে যাহাদের সহিত শত্রুতা স [illegible] পাইয়া একদিন রাত্রে তাহারা চার পাঁচ [illegible] য়া ফেলিল। জাগিয়া উঠিয়া মৃত্যুঞ্জয় দেখে, মশা [illegible] ক আলো-আলোময়। যেন সিংহের বিক্রম [illegible]। কুড়োনকে কাঁধে করিয়া লাঠি ঘুরাইতে ঘু [illegible] র হইয়া গেল, এতগুলি নরদের মধ্যে কাহারও [illegible] একটা হাত উঁচু করিয়া তুলে।

তারপর দেশ ছাড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে [illegible] র সীমানার মধ্যে। বল্লভের তখন রাজাপত [illegible] পাইয়া বাঁচিয়া গেলেন।

মৃত্যুঞ্জয়কে করিতে চাহেন ঢালিদলের [illegible] কিন্তু কিছুতেই রাজী নয়, বলে—না রায় মশায়, [illegible] জীবন নিয়ে খেলা আর করব না—বউ মরবার সময় [illegible]

বল্লভ, নাছোড়বান্দা, বলিলেন—দাঙ্গা-ফ্যাসাদে কোনদিন তোমায় পাঠাব না, তুমি কেবল আমার ঢালিদের খেলা শিখিও।

শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুঞ্জয় রাজী না হইয়া পারিল না, বলিল—বেশ, তাই হল। তোমার নুন যখন খাব তোমার জন্য জীবন দিতে পারব—কিন্তু কারো জীবন কখনো নেব না, এই চুক্তি—।

তারপর কত বড় বড় দাঙ্গা হইয়াছে, মৃত্যুঞ্জয় সে সবের মধ্যে না যাইয়া পারে নাই। কিন্তু এমন আশ্চর্য্য কায়দায় লাঠি চালাইত যে তাহার হাতে আর একটা লোকও মরে নাই।

এ সব যে আমলের কথা তখন বল্লভের চুলে পাক ধরিয়াছে, তাঁহার মায়ের বয়স আশীর উপর। গঙ্গাহীন দেশ—চাকদার এদিকে আর গঙ্গা নাই। মরণকালে বুড়ামায়ের গঙ্গালাভ হইবে না, এই আশঙ্কায় শেষের ক'টা দিনের জন্য মাকে চাকদায় পাঠান ঠিক হইল। রায় মহাশয়ের মা যাইতেছেন, সহজ কথা নয়—লাঠিয়াল-পাইক সাজিল, চাল-ডাল-ঘি লইয়া বিস্তর লোকজন আগে আগে ছুটিল, পথের মধ্যে মধ্যে জায়গা পরিষ্কার করিয়া পরম শুদ্ধাচারে হবিষ্যান্ন প্রস্তুত হইবে। তিন চারি দিনের পথ। ষোল বেহারা হুম্-হুম্ করিয়া বুড়ীকে বহিয়া লইয়া চলিল।

জ্যোৎস্না রাত, সাত ক্রোশ বেশ কাটিল—একশো পাইক জকার দিতে দিতে চলিয়াছে, কিন্তু সাত ক্রোশের মাথায় গিয়া পড়িল ঐ দুরন্ত খাল। পাড় ভাঙিয়া ডাক ছাড়িয়া দুই পাশের ধানবন

দলিয়া মলিয়া হু-হু বেগে খাল ছুটিতেছে, টানের মুখে কুটাটি ফেলিলে দুই খণ্ড হইয়া যায়। জলে নামিয়া খাল পার হইবে কাহার সাধ্য ?

পাল্কী নামাইয়া সমস্ত রাত সেই খালের পাড়ে বসিয়া। তারপর সকালে অনেক কষ্টে একখানা ডিঙা যোগাড় করিয়া খালে আনিয়া পাল্কী পার করিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু এত লোক জন বোঠে বাহিয়া গলদঘর্ম্ম, ডিঙা কিছুতেই খালে ঢুকিল না। দুইদিন সেখানে সেই অবস্থায় কাটাইয়া অবশেষে সকলে ফিরিয়া আসিল।

মা ফিরিয়াছেন শুনিয়া বল্লভ সকল কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া তাড়াতাড়ি দেখা করিতে আসিলেন। কিন্তু মা কথা কহিলেন না। এত কান্নাকাটী, কিছুতেই না। তারপর অকস্মাৎ উচ্চৈঃস্বরে কান্না—সে কি ভয়ানক কান্না!—নিজের পোড়া অদৃষ্টের কথা, মরিবার আগে গঙ্গাস্নানটাও হইল না—এই দুঃখ। বল্লভ রায়ের ভারী মনে লাগিল, কঠিন দিব্য করিলেন—তিন মাসের মধ্যে ঐ খাল বাঁধিয়া একেবারে চাকদা পর্য্যন্ত সোজা রাস্তা তৈয়ারী করিয়া সেই রাস্তায় মাকে নিজে পৌছাইয়া দিয়া আসিবেন, তাহা না পারিলে তিনি অব্রাহ্মণ। পরদিন হইতে হাজার লোক কাজে লাগিল। বল্লভ রায়ের ঢালাও হুকুম—খাল বাঁধিয়া চাকদা পর্য্যন্ত রাস্তা করিতেই হইবে, উহাতে সর্ব্বস্ব খরচ করিয়া পথের ফকির হইতে হয়, সেও স্বীকার। এপারে ওপারে রাস্তা বাঁধিতে বেশী বেগ পাইতে হইল না, কিন্তু খাল লইয়াই বাধিল বড় মুস্কিল।

নর-বাঁধ

এখন আর খালের কি আছে ? দুই কূল মজিয়া বিল হইয়াছে, মাঝখানে ক্ষীণ জলধারা। বর্ষার সময় টান হয় কিন্তু সে সব দিনের তুলনায় একেবারে কিছুই নয়। বল্লভের লোকজন জলের মধ্যে বাঁশ পুঁতিয়া রাজ্যের খড় সেই বাঁশের গায়ে বাঁধিয়া জলের বেগ কমাইবার কত চেষ্টা করিতে লাগিল, নৌকার পর নৌকা বোঝাই ইট ও মাটী খালে ঢালিল, কিছুতেই কিছু হয় না, সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া যায়। অথচ খাল বাঁধিতে না পারিলে প্রতিজ্ঞা পণ্ড হয়।

তিন মাসের আর তিন দিন বাকী। বল্লভ ত ক্ষেপিয়া গিয়াছেন. দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার—জয় মা চণ্ডিকে, মুখ রাখিস মা—বলিয়া চীৎকার করেন এবং খালের ধারে নিজে থাকিয়া রাতদিন তদারক করিতেছেন। কোন উপায় হইতেছে না। তিন দিনের মধ্যে সুরাহা না হইলে খালের জলে ডুবিয়া মরিবেন, মনে মনে মতলব আছে। এ সঙ্কল্পের কথা কাহাকেও বলেন নাই ; তবে ভ্রূকুটিময় ভীষণ মুখ দেখিয়া লোকজন মনে করে, ঝড় আসন্ন।

সে দিন গভীর রাত্রিতে সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আকাশ-ভরা মেঘ। বল্লভের চোখে ঘুম নাই, তাঁবু হইতে বাহির হইয়া একাকী নূতন-বাঁধা রাস্তায় পায়চারী করিতেছেন। এত অন্ধকার যে কোলের মানুষ দেখা যায় না। এমন সময় হু-হু করিয়া হাওয়া বহিয়া গেল। চারিদিকে প্রকাণ্ড বিল, ডাকভরের মধ্যে মানুষের বসতি নাই। এত বড় সাহসী মানুষ, তবু বল্লভের গা'টা ছম-ছম করিয়া উঠিল, ফিরিয়া

তাঁবুতে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং আশ্চর্য্য ব্যাপার, সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষু ঘুমে ঢুলিয়া পড়িল।

স্বপ্নে দেখিলেন, সশরীরে দেবী চণ্ডিকা—সে কথা বলিতে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে,—একেবারে সত্যসত্যই কালীমূর্ত্তি! তিনি যেন হাতের খাঁড়া নাড়াইয়া বল্লভকে ইসারা করিলেন, বল্লভ পিছু পিছু খাল-ধার অবধি আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর দেবী দেখিতে দেখিতে বাতাসে মিলাইয়া গেলেন। হঠাৎ ঝপ্‌পাস শব্দে কি-একটা খালে পড়িল, জল ছিটকাইয়া উঠিল; বল্লভ দেখিলেন,—স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, একটা কবন্ধ দেহ জলের টানে একবাব ভাসিয়া উঠিয়া পলকের মধ্যে তলাইয়া গেল, আর তাঁহার চোখের সামনে শূন্যে নিরবলম্বন ঝুলিতেছে মুণ্ডটি। বড় বড় চোখ ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে, গলা দিয়া রক্তের ধারা বহিয়া খালের জল লাল হইয়া গেল। মুণ্ডটার দিকে ভাল করিয়া তাকাইলেই বল্লভ যেন চিনিতে পারিবেন, কিন্তু চাহিতে পারিতেছেন না। এমন সময় সর্ব্বাঙ্গে অননুভূতপূর্ব্ব কম্পন জাগিয়া উঠিল, বল্লভের ঘুম ভাঙ্গিল। আগাগোড়া ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া তখনই গিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে ডাক দিলেন—মৃত্যুঞ্জয়, ও মৃত্যুঞ্জয়!

কুড়োনকে লইয়া মৃত্যুঞ্জয় খালের ধারে মাদুর মুড়ি দিয়া শুইয়া ছিল। বাপে-বেটায় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। ইসারা করিয়া বল্লভ তাঁবুতে ডাকিলেন। আবার ইসারা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে একা একাই আসিতে

বলিলেন—কুড়োন ওখানে থাকুক, বড় গোপন ব্যাপার। ছেলেকে রসাইয়া রাখিয়া নিঃশব্দে দুজনে অগ্রসর হইল। আট দশ পা আসিয়াছে—এমন সময়ে মৃত্যুঞ্জয়ের পিছনে কাপড়ে টান, তাকাইয়া দেখে কুড়োন আসিয়া কাপড় ধরিয়াছে। বল্লভ ফিরিয়া চাহিলেন, আবার বাঁ হাত নাড়িয়া উহাকে রাখিয়া আসিতে বলিলেন। মৃত্যুঞ্জয় জোর করিয়া কাপড় ছাড়াইয়া লইল ত কুড়োন বাপের হাত জড়াইয়া ধরিল। অন্ধকারে ভয় করিতেছে, সে কিছুতেই বাপকে ছাড়িবে না। মৃত্যুঞ্জয় ধমক দিল, মিষ্ট কথায় বুঝাইল, কিন্তু তেপান্তরের মাঠের মধ্যে আঁধার অশ্বত্থগাছের কাছে বালক কিছুতেই বসিয়া থাকিবে না। অগত্যা কুড়োনকেই তাঁবুর মধ্যে পাঠাইয়া দিয়া দু'জনে খালের ধারে বসিয়া পরামর্শ হইতে লাগিল।

কিছুই সাব্যস্ত হয় না। মৃত্যুঞ্জয়ের সেই এক কথা—আমি জীবন দিতে পারি রায়মশায়, জীবন নিতে পারবো না—সে তো তুমি জানো। তোমার হুকুম মানি কি করে'?

বল্লভ কহিলেন—আমার হুকুম নয়, চণ্ডীর হুকুম। স্বপ্নে আমায় স্পষ্ট দেখিয়ে দিল—নররক্ত না খেয়ে বেটী কিছুতে খাল বাঁধতে দেবে না—

মৃত্যুঞ্জয় নিজের প্রকাণ্ড বুকের উপর থাবা মারিয়া বলিল—আমাকেই তবে বলি দাও। তোমার নুন খেয়েছি, তাতে পিছপাও নই।—কুড়োন থাকবে, তাকে তুমি দেখো।

কিন্তু ইহা কাজের কথা নয়। বল্লভ শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, জানেন যে ইহা অব্যর্থ। বলিলেন—তোমার দরকার হবে না মৃত্যুঞ্জয়, আমি আছি। সে সব মনে মনে আমার ঠিক করাই আছে। তুমি একবার খোঁজাখুঁজি করে' দেখে এস—হোক না হোক পরশু রাত পোহাবার আগে ফেরা চাই। নরবলির ভাবনা কি? বলিয়া আরও গম্ভীর হইলেন।

মৃত্যুঞ্জয় উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু দাঁড়াইয়াও কি ভাবিতে লাগিল।

বল্লভ বলিলেন—নাস্তিকের মত কথা বল কেন? জীবন নেওয়া তুমি বল কারে? মায়ের পূজোর বলি জোগাড় করে' আনা আর মানুষ খুন করা এক কথা হল? ছি—ছি—ছি—

সেই টানিয়া-টানিয়া বলা ছি-ছি-ছি মৃত্যুঞ্জয়কে যেন তিনবার মুগুর মারিল। মনিবের হুকুমের পর আর কোনদিন সে দ্বিরুক্তি করে নাই। কহিল—আমি মুখ্যু মানুষ, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম বুঝিনে। তুমি ব'ল্লে রায় মশায়, দোষ হয় না—আমি চল্লাম। কুড়োন রইল তোমার তাঁবুতে, বড় ভীতু,—ওকে দেখো—

দীর্ঘমূর্ত্তি অন্ধকারে অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় অদৃশ্য হইল। বল্লভ তাঁবুর মধ্যে ঢুকিলেন। দেখিলেন, আলগা খড়ের উপর বল্লভের বিছানার পাশে কুড়োন বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছে।··

মাঝে একটা দিন-রাত্রি, তারপর আরো একটা দিন কাটিয়া রাত্রি আসিল। শেষের রাত্রি! কাল সন্ধ্যার সময় ঠিক তিন মাস পূর্ণ হইয়া যাইবে। প্রতিজ্ঞা পণ্ড হইয়া গেলে তাহার পর খাল বাঁধা না বাঁধা একই কথা। এই রাত্রির মধ্যেই ক্ষুধিত করালীর বলি চাই, নররক্তে খালের জল লাল হইলে তবে জলের বেগ কমিবে।

বল্লভ জানেন, একেবারে নিশ্চিন্ত আছেন—যেমন করিয়া হোক মৃত্যুঞ্জয় রাত্রির মধ্যে বলি লইয়া ফিরিয়া আসিবেই। সন্ধ্যার আগে সমস্ত লোকজন বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা পাঁচক্রোশ দূরের গ্রামে চলিয়া গেল। নরবলির কথা ঘুণাক্ষরে কেহ জানে না। বাহিরে কেবলমাত্র প্রকাশ, কার্য্যসিদ্ধির জন্য রায় মহাশয় ভয়ঙ্কর কালী সাধনা করিতেছেন; আজ তার পূর্ণাহুতি।

পরম সৌভাগ্যবান উৎসর্গিত বলির মানুষটি যখন আর্ত্তনাদ করিবে সে কণ্ঠ দেবতা ছাড়া যাহাতে বাহিরের কানে না পৌঁছায় বল্লভ সর্ব্বরকমে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু সামান্য একটা খুঁত রহিয়া গেল—সে কুড়োন। কত লোভ দেখান হইল, কত বুঝান হইল—সে কিছুতেই গ্রামে গেল না। তাহার ভয় করে, আর কোথাও গিয়া থাকিতে পারে না। হতভাগা ছেলে চিনিয়া রাখিয়াছে কেবল বাবাকে আর রায়-মশায়কে। দুইদিন বাবাকে দেখে নাই, ভারী মন কেমন করে. গোপনে গোপনে খুব কাঁদিয়া থাকে—কিন্তু বল্লভকে দেখিলে চোখ

মুছিয়া হাসে, তঁর সামনে কান্নাকাটি করা বড় লজ্জার ব্যাপার বলিয়া মনে ক'ব।

কুড়োন তাই রহিয়া গিয়াছে। তা ঐ বালকের জন্য ভাবনা কিছু নাই। একবার ঘুমাইয়া পড়িলে ঢাক-ঢোল পিটাইয়াও তাহার ঘুম ভাঙানো যায় না। নিশি-রাত্রির ব্যাপার সে কিছু জানিতে পারিবে না।

প্রহরের পর প্রহর নিঃশব্দে কাটিয়া যাইতেছে, মৃত্যুঞ্জয় এখনো ফিরিল না। কুড়োন ঘুমাইয়া পড়িলে বল্লভ অনেকক্ষণ ধরিয়া নূতন হাঁড়িতে ঘসিয়া ঘসিয়া খড়্গ শানাইয়াছেন, অন্ধকার তাঁবুর মধ্যে রক্ত-লোলুপ সেই শাণিতাস্ত্র ঝকমক করিতেছে। ক'দিন রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া চক্ষু আগুনের ভাঁটার মত লাল; আজ আবার রক্তবর্ণের চেলী পরিয়াছেন, কপালে, বাহুতে বড় বড় সিঁদূরের ফোঁটা। বাতাসে এক-একবার ধানবন কাঁপিয়া ওঠে, অশ্বত্থগাছের দু'চারিটা পাতা উড়িয়া তাঁবুর কাছে পড়ে, অমনি কাঁধের উপর খড়্গ তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়ান। শেষে আর তাঁবুর মধ্যে তিষ্ঠাইতে পারিলেন না, খড়্গ কাঁধে বাহিরে আসিলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ, ভয়ঙ্কর অন্ধকার; কোনখান হইতে খালের আরম্ভ বুঝিবার উপায় নাই। জলস্থল একাকার হইয়া গিয়াছে। বাতাসও বন্ধ হইয়া গিয়াছে, গাছের পাতাটি নড়ে না। বল্লভের মনে হইল, বুঝি এইমাত্র মহাপ্রলয় হইয়া গেল, শব্দময় প্রাণপ্রবাহ স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে, জীবজগৎ নাই, জন্মমৃত্যু সমস্তই একাকার,...তিনিও এইবার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া পড়িয়া যাইবেন। নিঃশব্দতা পাথর হইয়া বুক

চাপিয়া ধরিয়াছে, প্রতি মুহূর্ত্তেই চাপ বাড়িতেছে। অসহ্য মনে হইল। চীৎকার করিয়া উঠিলেন—জয় মা চণ্ডিকে! সেই চীৎকারে নিজেরই সর্ব্বদেহ শিহরিয়া উঠিল। দেবী চণ্ডী উপবাসী ;—বল্লভের মনে হইল রক্তবুভুক্ষু মুণ্ডমালিনী তাঁর ঠিক সামনেই অতল অন্ধকারের মধ্যে কৃপাণ মেলিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছেন। মাথার মধ্যে রক্ত চড়িয়া উঠিল। মনে হইল, অশ্বত্থগাছের তলা হইতে দ্রুতপদে কাহারা বাহির হইয়া আসিতেছে—এক—দুই—তিন—চার—···অনন্ত। ডাকিলেন—কে? কারা? উত্তর নাই। খুব জোরে আবার ডাকিলেন—কে? কে? কে? গাছের তলায় গিয়া দেখিতে লাগিলেন। এক হাতে শক্ত মুঠায় খড়্গ ধরিয়া আর এক হাত বাড়াইয়া অসমান গুঁড়ির চারিদিক হাতড়াইতে লাগিলেন। উপরে তাকাইয়া দেখিলেন। বোধ হইল, ডালপালার ভিতরে প্রকাণ্ড ঢালের মতো একটা স্লেলহান জিহ্বা লকলক করিয়া দুলিতেছে এবং জিহ্বার দুই পাশ দিয়া দেহহীন, চক্ষুর আশ্রয়হীন কেবলমাত্র দুইটি দৃষ্টি হাউইবাজীর মতো আগুন ছড়াইতে ছড়াইতে তাঁহার দিকে অতি দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। খড়্গ উঁচু করিয়া তুলিয়া দেখেন, লোহার উপরে যে চক্ষুটি অঙ্কিত ছিল তাহাও আগুন হইয়া জ্বলিয়া একেবারে চোখাচোখি তাকাইয়া আছে। ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ছুটাছুটিতে মাথার মধ্যে আগুন যেন টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তাঁবুর চারিপাশে খালের পাড়ে অশ্বত্থতলায় নূতন বাঁধা রাস্তার উপর দিয়া বল্লভ দুমদুম করিয়া পা

ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ছিন্নমস্তার মতো নিজের মাথা নিজেরই কাটিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইল। অন্ধকার তরল হইয়া আসিতেছে, পূর্ব্বাকাশে রক্তিমাভা। রাত্রি পোহাইতে আর দেরী নাই। বল্লভ রায় পাগল হইয়া উঠিলেন। মৃত্যুঞ্জয় এখনো ফিরিল না, সে বিশ্বাস-ঘাতক। ঠিক বুঝিলেন, বড় অনিচ্ছার সহিত গিয়াছিল,—এখন চক্রান্ত করিয়া কোন দেশে পলাইয়া বসিয়া আছে। কাল বল্লভ সর্ব্ব রকমে অপদস্থ হইলে তারপর হয়ত ফিরিয়া আসিবে। প্রান্তর কাঁপাইয়া প্রবল হুঙ্কার দিলেন—জয় মা চণ্ডিকে!—খড়্গ লইয়া তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

কুড়োন জাগে নাই, বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছিল, একবার ঘুমাইলে কিছুতে ঘুম ভাঙ্গে না। বল্লভ আর একবার চীৎকার করিলেন—জয় মা—

কুড়োন জাগিল না।

ভালো করিয়া ফর্শা না হইতেই মৃত্যুঞ্জয় ফিরিয়া আসিল। দু'দিনে সে অনেক দূর গিয়াছিল, অবশেষে রাত্রিবেলা এক সুকুমার ব্রাহ্মণ শিশুকে ঘুমন্ত অবস্থায় চুরিও করিয়াছিল। মুখ বাঁধিয়া কাঁধের উপর ফেলিয়া ক্রোশ পাঁচ-ছয় ছুটিয়া আসিয়াছে, এমন সময় গুড়-গুড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল—বিদ্যুৎ চমকাইল। মাঠের মধ্যে তাহার

আলো পড়িল বালকের মুখের উপর। চাহিয়া দেখে, ছেলেটি জাগিয়াছে —ভীতি-বিহ্বল অসহায় দৃষ্টি, মুখ বাঁধা বলিয়াই শব্দ করিতে পারিতেছে না, এক-একবার গলার মধ্যে ঘড়-ঘড় আওয়াজ উঠিতেছে। কে যেন মৃত্যুঞ্জয়ের পা দু'খানা ঐখানে আটকাইয়া ফেলিল। তাকাইয়া তাকাইয়া বারবার ছেলেটির মুখ দেখিতে লাগিল। হঠাৎ মনে হইল, সে যেন কুড়োনের মুখ বাঁধিয়া হাঁড়িকাঠের মধ্যে লইয়া যাইতেছে। মাঠ পার হইয়াই এক গৃহস্থ বাড়ী। তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপে ছেলেটিকে নামাইয়া রাখিয়া মৃত্যুঞ্জয় ছুটিয়া পলাইল। বিল ভাঙিয়া সোজাসুজি দৌড়িয়া আসিয়াছে, ধানবনের মরমর্ ধ্বনিতে পিছল পথে অনবরত পিছন হইতে মুখ-বাঁধা বালকের ঘড়ঘড়ানি গলার আওয়াজ শুনিতে শুনিতে আসিয়াছে। খালের ধারে আসিয়া বল্লভকে দেখিতে পাইল। জলের কাছে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া তিনি গভীর মনোযোগের সহিত নীচের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

বল্লভের সম্বিৎ নাই। দেখিতেছেন—গভীর নিম্নদেশে জমা রক্তের চাপ গুলিয়া গিয়া ক্রমশঃ সমস্ত খালের জল রাঙা হইয়া উঠিতেছে, একটু একটু করিয়া জলের বেগ কমিতেছে, এক-একবার মাটির চাঁই জলে ফেলিয়া পরীক্ষা করিতেছেন—না, আর তেমন আগের মতো পাক খাইয়া মাটি ভাসাইয়া লইয়া যায় না। এইবার—এখনি—আর একটু পরে জল স্থির হইয়া দাঁড়াইবে।…মৃত্যুঞ্জয় অনেকক্ষণ পিছনে বসিয়া রহিল। রায় মহাশয়ের এ ভাব সে আর কখনও দেখে নাই। ডাকিতে

সাহস হইল না। শেষকালে উঠিয়া গিয়া বল্লভের তাঁবুর মধ্যে ঢুকিল। তাঁবুর মধ্যে কুড়োন নাই। এক পাশের অনেকগুলি খড় তুলিয়া ফেলা হইয়াছে, নীচের শুকনা ঘাস বাহির হইয়া পড়িয়াছে, আর আশেপাশের খড়ের উপর তাজা রক্তের ছিটা। যে-মৃত্যুঞ্জয় সমস্ত যৌবনকাল হাতে পায়ে রক্ত মাখিয়া নাচিয়া বেড়াইয়াছে, বুড়া বয়সে ক'ফোঁটা রক্ত দেখিয়া তাহার সর্ব্বদেহ কাঁপিয়া উঠিল। বল্লভকে গিয়া বলিল—রায় মশায় আমার কুড়োন কোথায়?

বল্লভ তার দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন, সে দৃষ্টির কোন অর্থ হয় না।

মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার হাত ধরিয়া প্রকাণ্ড ঝাঁকি দিয়া বলিল—শুনছ? শুনছ? তোমার কাছে রেখে গেছলাম, আমার কুড়োন কোথায় গেল? বলে দাও—সে কোথায় গেল?

উদ্‌ভ্রান্তের মতো মৃত্যুঞ্জয় চলিয়া গেল, এক ফোঁটা চোখের জল পড়িল না। পরদিন সমস্ত দিনমান কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইল কেহ বলিতে পারে না। এদিকে চাঁটগার দিকে যে কারকুন গিয়াছিল—এমনি দৈবচক্র, সকাল বেলাতেই বিস্তর লোক লইয়া সে আসিয়া পড়িল। সন্ধ্যার মধ্যেই খাল বাঁধা শেষ।

বল্লভের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল, কিন্তু তিনি আর শান্তি পাইলেন না।

সেদিন নিশীথরাত্রে বল্লভ জাগিয়া ছিলেন। হঠাৎ সদ্য-সমাপ্ত বাঁধের উপর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে মৃত্যুঞ্জয় আসিয়া বল্লভের হাত ধরিয়া

আগের দিনের মতো প্রশ্ন করিল—আমার কুড়োন কোথায় গেল? তাকে কোথায় রেখেছ—বলে দাও—বলে দাও—। বল্লভ কেবল হতভম্বের মতো তাকাইয়া দেখিলেন। আবার মৃত্যুঞ্জয় ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ইহার পরে বল্লভের যে কি হইল, তিনি আর বাড়ী ঘরে ফিরিলেন না। দিনরাত খালের ধারে তাঁবুর মধ্যে চুপ করিয়া কাটাইতেন। মৃত্যুঞ্জয়ের বড় ছেলে যাদবকে খবর দিয়া আনা হইল। বিস্তর জমিজমা দিয়া তাহাকে বসত করাইলেন। লোকে বলে, মৃত্যুঞ্জয় নাকি প্রতিরাত্রেই আসিত। দিগন্তবিসারী জনহীন প্রান্তরের মধ্যে নিস্তব্ধ নিশীথে প্রভু-ভৃত্যে কথাবার্তা হইত, বল্লভের কোন কোন কর্মচারী তাহা স্বকর্ণে শুনিয়াছে। মৃত্যুঞ্জয় বলিত—রায় মশায়, আমি জীবন দেবো—জীবন নেবো না কখনো। বল্লভ বলিতেন—সে আমি জানি, জানি—তুই কক্ষনো জীবন নিবিনে—

তবু বল্লভ রায়ের জীবন গেল। মাস দেড়েক পরের কথা. পরিষ্কার পূর্ণিমা রাত, ভাদ্র মাসের শেষ কোটাল। বাঁধের গায় প্রবল বেগে জোয়ারের জল ধাক্কা দিতেছে। হঠাৎ তুমুল কলকল্লোল শুনিয়া বল্লভ রায় ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন বাঁধ ভাঙিয়াছে, হু-হু করিয়া খালের মধ্যে জল ঢুকিতেছে। দেখিতে দেখিতে সমস্ত বাঁধের আর চিহ্নমাত্র রহিল না। তারপর দেখিলেন ওপারে জ্যোৎস্নার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইয়া আছে। ঠিক এই সময়ে রোজই সে মনিবের কাছে

আসিত। বাঁধ ভাঙিয়া যাওয়ায় আজ আর তাঁর কাছে আসিতে পারিতেছে না। মৃত্যুঞ্জয় ডাকিতে লাগিল—রায় মশায়, রায় মশায়,—

বল্লভ বলিলেন— কি করে' যাই ? দেখছিস জলের টান !

সে বলিল—চলে এস, মোটে হাঁটু জল—। ওপার হইতে মৃত্যুঞ্জয় নামিয়া .আগাইয়া আসিতে লাগিল, হাঁটু জলও নয়। এপারে বল্লভ নামিলেন। কিন্তু এপারে জল বেশী, বুকজল ক্রমে গলাজল হইয়া দাঁড়াইল। বল্লভ ডাকিয়া বলিলেন—তুই এগিয়ে আয় মৃত্যুঞ্জয়, আমি আর পারছিনে। মৃত্যুঞ্জয় কহিল—আর একটু রায় মশায়, আর একটু—এইবার জল কমবে। জলের টানে ঘুমন্ত অবোধ বালকের চাপা কান্নার মতো শোনা যাইতে লাগিল। মাথার উপর মেঘনির্মুক্ত পূর্ণিমার চাঁদ। মাঝখানে আসিয়া দুজনে প্রবল আকর্ষণে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল। তারপর জোয়ারের বেগে কে কোথায় ভাসিয়া গেল, তাহা কেহ জানে না।

দ্বারিক দত্ত আর কি-কি বলিয়াছিলেন পনের বছর পরে এখন তাহা মনে নাই। তবে এটা মনে পড়ে—সে দিন সন্ধ্যায় ভাঁটা সরিয়া গিয়া ঈষন্নিম্ন সমতল নদীগর্ভ অনেক খানি অনাবৃত হইয়া পড়িয়া

ছিল এবং চাঁদের আলোয় বালুকারাশি চিক-চিক করিতেছিল।—গল্প শুনিতে শুনিতে একটু পরেই চোখ বুজিয়া জড়সড় হইয়া পড়িলাম, ভয়ে রাতের মধ্যে চোখ আর মেলি নাই।

পরদিন গোধূলি-লগ্নে নির্ব্বিঘ্নে ছোট কাকার বিবাহ হইয়াছিল, বরযাত্রীরাও আকণ্ঠ মিষ্টান্ন ভর্ত্তি করিয়াছিলেন। সেই ছোট কাকী এখন পাঁচটী ছেলেমেয়ের মা। দেখিতে দেখিতে পনেরটা বছর কাল-সমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে শেষের বছর দশেক আমরা একদম দেশছাড়া। বাড়ীসুদ্ধ সকলে কাশীতে আছি—সেখানে বাবা কাঠের ব্যবসা দিব্য জমাইয়া বসিয়াছেন। অবস্থা ফিরিয়াছে। কেবল ফি বছর বাবা স্বয়ং একবার করিয়া দেশে যান। স্বদেশপ্রেমবশতঃ নয়, পুঁটিমারীর বিলে সুবিধামতো অনেক জায়গা-জমি কেনা হইয়াছে বলিয়া। যদিও দক্ষ নায়েব একজন আছে, তবু নিজে গিয়া এক-একবার দেখিয়া আসিতে হয়।

এদিকে আমি আইন পাশ করিয়া একরকম নিরুপদ্রব হইয়া আবার কাশীর বাড়ীতে অধিষ্ঠান করিয়াছি। বাবা জানেন, আমিও জানি—ঐ পাশের বেশী আমার দ্বারা আর কিছু হইবে না। সুতরাং কোর্টে যাইবার জন্য কোন পীড়াপীড়ি নাই। যে দিন বীণার সঙ্গে ঝগড়া হইয়া যায়, ভারী রাগ করিয়া গায়ের উপর চোগা চাপকান

চাপাইতে লাগিয়া যাই—আবার হাসিয়া যখন সে তুয়ার আটকাইয়া দাঁড়ায় ঐ বোঝা নামাইয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত আরামে শুইয়া পড়ি। এমনি চলিতেছিল। ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি একদিন হঠাৎ বাবা ডাকিয়া বলিলেন—একবার দেশে যাও, কাল পরশুর মধ্যে—

অবাক হইয়া গেলাম। দশ বছরের অভ্যাসক্রমে বাংলা-মুলুকের সেই সুতুর্গম গ্রামটী মন হইতে ক্রমাগত দূরে সরিতে সরিতে প্রায় আন্দামান দ্বীপের সমান তফাৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাপ হইয়া এমন বিভ্রাট বাধাইতে চান কেন ?

কহিলাম—কেন, আপনি ?

বাবা কহিলেন—আমি নাগপুরে যাচ্ছি হপ্তাখানেকের মধ্যে, কাঠের চালান আনতে। সে তো তুমি পারবে না ?

না, তাহাও পারিব না। অতএব চুপ করিয়া রহিলাম।

বাবা বলিতে লাগিলেন—পুঁটিমারীর জমি নিয়ে প্রজাদের সঙ্গে গণ্ডগোল বেধে উঠেছে—ঘনশ্যাম চিঠি লিখেছে। আবার মামলা-টামলা হবেই—ও বেটা তো রাঘব বোয়াল—টাকাকড়ি হাতে যা পাবে নিজেই গিলবে। তুমি গিয়ে কিস্তির মুখটা কাটিয়ে সব মিটমাট করে দিয়ে এসোগে। লেখাপড়া শিখেছ, আইন পাশ করলে, অন্ততঃ নিজেদের এষ্টেটপত্তোরগুলো দেখাশুনা কর।

হায়, কি কুক্ষণেই আইন পাশ করিয়াছিলাম !

দিন চার-পাঁচ পরে একটা স্থটকেশ হাতে করিয়া রাত্রির মেলে মধুগঞ্জ ষ্টেশনে নামিলাম। প্রায় দশ বছর আগে আর একদিন রাত্রে এখান হইতে গাড়ী চাপিয়াছিলাম, সে সব দিনের কথা ভাল মনে নাই। তবু মনে হইল, ষ্টেশনটী প্রায় এক রকমই আছে। রাত্রি আর বেশী নাই, খোলা ওয়েটিং-রুম দিয়া প্লাটফরম অবধি মাঠের জোলো হাওয়া আসিতেছে। এ সময়ে যাহার নিতান্ত গরজ, তেমন লোক ছাড়া আর কাহারো জাগিয়া থাকার কথা নয়। কিন্তু ট্রেনের মধ্যে থাকিতেই তুমুল গণ্ডগোল কানে আসিতেছিল। ওয়েটিং-রুমে দাঙ্গা বাধিয়াছে নাকি? যেই সেখানে পা দিয়াছি আর যাইবে কোথায়—জন পঁচিশেক মানুষ চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া যেন ছঁাকিয়া ধরিল। সকলেই জিজ্ঞাসা করে—কোথায় যাবেন? কোথায় যাবেন? সাঁতার-না-জানা মানুষ গভীর জলের মধ্যে পড়িলে যেমন হয় আমার দশা সেই প্রকার। কোন দিকে কূল-কিনারা দেখি না, পলাইবার পথ নাই। উত্তর না দিলে কেহ পথ ছাড়িবে না, কাজেই বলিয়া ফেলিলাম—যাব সাগরগোপ। যেইমাত্র বলা অমনি একজনে ডান হাতের স্থটকেশটী ছিনাইয়া লইয়া দৌড়। পলক ফিরাইয়া দেখি, অন্য সকলে ঐ সঙ্গে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। কিঞ্চিৎ দূরে আর একজন হতভাগ্য যাত্রীরও আমার দশা। সে দিকে আর না গিয়া পাশ কাটাইয়া সরিয়া আসিলাম। তা তো হইল—এখন আমার উপায়? স্থটকেশের মধ্যে আমার সমুদয় কাপড়-চোপড় এবং দশখানি দশ টাকার নোট

রাখিয়াছিলাম। যশোহরে যে সদর জায়গায় দল বাঁধিয়া আজকাল এমন রাহাজানি স্থরু করিয়াছে তাহা জানিতাম না। মিউনিসি-প্যালিটির রাস্তায় মাইল অন্তর কেরোসিনের আলোর ব্যবস্থা আছে, কালিতে কালিতে রাত্রিশেষে আলোগুলি এমন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে যে সে আলোকে চোর চিনিয়া ধরা দূরের কথা, নিজের হাত-পা গুলি চিনিয়া লওয়াই মুস্কিল। সামনের রাস্তায় নামিয়াছি, ভক করিয়া পিছনে আওয়াজ। তাকাইয়া দেখি, সর্বনাশ—প্রায় ঘাড়ের উপরে একখানা বাস আসিয়া পড়িয়াছে। এক দৌড়ে আগে গিয়া প্রাণটা বাঁচাইলাম। তারপর ভালো করিয়া চাহিয়া দেখি, কেবল একখানা নহে—সারি সারি ঐ রকম বিশ-ত্রিশখানি বাস। সকলেই ষ্টার্ট দিয়াছে, একবার আগাইতেছে, একবার পিছাইতেছে এবং তারস্বরে কে কোথায় যাইবে তাহা ঘোষণা করিতেছে। চীৎকারের যেন প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। ঠিক সামনে যে গাড়ীখানা ছিল তাহার ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—বলতে পার, আমার স্থটকেশ নিয়ে এদিক দিয়ে কে পালাল ?

ড্রাইভার হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে আস্থন—এই যে—আপনি সাগরগোপ যাবেন তো! উঠে পড়ুন—এই নিন আপনার জিনিষ।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। ভয় ধরাইয়া দিয়াছিল। ঝাঁঝের সহিত কহিলাম—তুমি বেশ লোক তো বাপু, না বলে কয়ে স্থটকেশ নিয়ে চম্পট—

ড্রাইভার সবিনয়ে বলিল—আজ্ঞে, সে তো আপনার সুবিধের জন্যে। ভারী জিনিষ বয়ে আনতে অসুবিধে হচ্ছিল, তাই দেখে—বলিয়া কথা শেষ না করিয়াই আরো দুইটি লোক প্লাটফরম পার হইয়া আসিতেছিল, তাহাদের পাকড়াও করিতে ছুটিয়া গেল।

সুস্থির হইয়া বসিয়া চারিদিক তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিয়া সম্ভ্রমের উদয় হইল। লোকে সভ্য হইয়া উঠিতেছে বটে, মফঃস্বল শহরেও তাহার ব্যতিক্রম নাই। সামনেই হিন্দু চায়ের দোকান, সাইনবোর্ডে বড় বড় করিয়া লেখা—এই যে গরম চা, আসুন—সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রস্তুত। ট্রেণ হইতে নামিয়া ইতর-ভদ্র দলে দলে গিয়া সেই সাত্ত্বিক চা খাইতে বসিয়াছে। নূতন বায়স্কোপ খুলিয়াছে, ষ্টেশনের দেয়াল জুড়িয়া তার বিজ্ঞাপন···ভ্রাম্যমান সাড়েবত্রিশভাজা-ওয়ালার ঠুন-ঠুন ঘণ্টার বাজনা···ডাক্তারখানার লাল-নীল আলো···দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল শিয়ালদহের মোড়ের খানিকটা যেন এখানে আনিয়া বসাইয়া দিয়াছে।

ড্রাইভার ফিরিয়া আসিয়া নিজের জায়গায় বসিল। গাড়ী এক্কেবারে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে যে একরূপ অখণ্ডমণ্ডলাকার অবস্থা। তা'ছাড়া এতগুলি মানুষ নিতান্ত মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া বসিয়া নাই। গাড়ী ছাড়িলে নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিলাম। হুস্ হুস করিয়া শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—এগাড়ী যাবে কদ্দুর অবধি ?

ড্রাইভার কহিল—আপনি ত নামবেন সাগরগোপে—তারপর বাঁকাবরুশী মাদারডাঙা ছাড়িয়ে চলে যাবে সেই কাটাখালির কাছ বরাবর—

—নর-বাঁধ পার হবে কি করে ?

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সে আমার দিকে তাকাইল। বলিল—দেশে থাকেন না বুঝি ? সেখানে গেল-বছর মস্ত পুল হয়ে গেছে ; টার্ণার-ব্রিজ—টার্ণার সাহেবের আমলের কিনা ! দেশের আর কি সেদিন আছে !

মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, সত্যই সেদিন আর নাই। বারো-চৌদ্দ বছর আগে একবার এই শহরে আসিয়া বাবার সঙ্গে তিন দিন ছিলাম। তখন এখানে এক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আর এক পুলিশ সাহেবের মাত্র এই দু'খানি মোটরগাড়ী ছিল। বিকালে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিজে গাড়ী চালাইয়া চৌরাস্তার পথে বেড়াইতে যান, কথাটা শুনিবার পর পাকা তিন ঘণ্টা রাস্তার পাশে তীর্থকাকের মতো ধর্ণা দিয়া তবে হাওয়াগাড়ী দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেই জীবনে প্রথম মোটর দেখা।

ড্রাইভার লোকটির উৎসাহ কিছুতেই খর্ব্ব হইতে ছিল না। বোধ করি, সে স্কুল-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়টি ভাল করিয়া পাঠ করিয়া থাকিবে। আবার আরম্ভ করিল—যাই বলুন মশায়, আপনাদের স্বরাজ-টরাজ ফক্কিকার, এমন কোম্পানীর রাজার মতো

কেউ হবে না—রাস্তা-ঘাট রেল-ষ্টীমার ট্যাক্সি-বাস আর কি চাই?" করুক দেখি কোন্ বেটা পারে ?

ঘুমের ঘোরে নবনির্মিত টার্গার-ব্রিজ কোন সময়ে পার হইয়া আসিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারি নাই। সাগরগোপের স্কুলঘরের কাছে নামিলাম, তখন বেশ বেলা হইয়াছে। এখান হইতে মাইলটাক হাঁটিয়া বাড়ি যাইতে হয়। ডাহিনে দেখিলাম, পুঁটিমারীর বিলে জল চক-চক করিতেছে। চমক লাগিল—কাণ্ডখানা কি? দশ বছর আগেকার কথা সঠিক মনে নাই। তবু আবছা স্বপ্নের মতো মনে পড়ে—এই সময়ে ঘন সতেজ সবুজ ধানে এই বিল ভরিয়া থাকিত। যত দিন দেশে ছিলাম ইহার কখন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পাঁচু মোড়ল, বিশে মোড়ল, রাইচরণ দাস, সর্দারেরা দু'ভাই—কান্তরাম-শান্তরাম, —ইহারা ফি বছর এক-একটা গোলা বাঁধিত। গোলা তৈয়ারী করা এ অঞ্চলের মানুষের যেন নেশার মতো হইয়া গিয়াছিল। তেঁতুলতলায় মুচিরা রান্না করিত, ঢপ-ঢপ করিয়া কুড়ালের উপর মুগুরের ঘা দিয়া বাঁশ ফাটাইত, সর্দারদের মজাপুকুরে আটি বাঁধিয়া বাখারী পচাইতে দিত, সমস্ত কথা মনে পড়িতে লাগিল।

রাস্তার পাশে একজন লোক একমনে বসিয়া মাছধরা দোয়াড়ি বুনিতেছিল। কহিলাম—মাছ পড়ছে খুব ?

লোকটি উত্তর করিল না, তাকাইয়াও দেখিল না।

সেটা বটতলা। শিকড়ের উপর দাঁড়াইয়া তরঙ্গাকুল সীমাহীন

জলরাশি দেখিতে বেশ লাগিতেছিল। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলাম—ও মোড়লের পো, বিল যে এবার একদম ওঠেনি—বড্ড বর্ষা হয়েছিল বুঝি—

এবার লোকটি চাহিয়া দেখিল। হাতের কাছের একখণ্ড বাঁশ আগাইয়া দিয়া কহিল—বসুন।

আমি বলিলাম—না, বসবো না আর—তোমাদের বাড়ী বুঝি ঐ গাঁয়ে। ঘরগুলো. বেশ দেখাচ্ছে, ঠিক সুন্দর একটা দ্বীপের মতো—

দ্বীপ কাহাকে বলে লোকটার জানা নাই, অতএব দ্বীপের সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারিল না। মোটে সেদিক দিয়াই গেল না। কহিল—বাবু, আমরা মহারাণীর কাছে দরখাস্ত করব—কিছু হবে না?

—দরখাস্ত কিসের?

—নর-বাঁধ বেঁধে ছোট করে পোল দিয়েছে, মহারাণী এসে পোল ভেঙে দিয়ে যান। এত বড় বিলের জল এই ফাঁকটুকুতে বেরোয় কখনো? তিনি নিজের চোখে একবার দেখে যান না—

ভারী বিরক্ত হইলাম। যত ভাল কাজই গবর্ণমেণ্ট করুক না কেন দেশের লোকের খুঁত ধরা কেমন স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুদূর পাড়াগাঁয়েও সে বিষ ঢুকিতে বাকী নাই। বলিলাম—টাকাকড়ি খরচ করে পোল দিয়েছে—বড্ড অপরাধের কাজ করেছে। আগে এখানে বুক জল হ'ত—লোকে পার হ'ত গামছা পরে। আর আজকে

দিব্যি মোটরে করে চলে এলাম—এক ফোঁটা জল-কাদা গায়ে লাগল না, কত বড় সুবিধে বল দিকি!

লোকটি ভাঙিয়া উঠিল। রুক্ষকণ্ঠে কহিল—ছাই হয়েছে, ঘরদোর জায়গাজমি জলে ডুবে রয়েছে—। হঠাৎ গলার স্বর ভারী হইয়া উঠিল। বলিতে লাগিল—এ কি রকম জুলুমবাজি! গোলায় এক চিটে ধান নেই—ঘরের মধ্যে ভাসা-বাদার সাপ উঠছে, খুঁটির গোড়ার মাটী জলে ধুয়ে যাচ্ছে, কোন দিন ঘরখানাই বা ধ্বসে যায়। সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে ছেলেপুলের হাত ধরে এখন কোথায় যাব? বলিতে বলিতে লোকটী চুপ করিল। বোধকরি বা কান্না সামলাইল। পুরুষ মানুষের কাঁদিতে নাই কিনা।

একটু স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল—বুঝিয়ে সুঝিয়ে লিখলে মহারাণীর ঠিক দয়া হবে—কি বল বাবা? তুমি যাচ্ছ কোন গাঁয়ে?

—ওই ত সামনেই—ইন্দির ঘোষ মশায়ের বাড়ি। আমি তাঁর ছেলে, এখন বাড়িঘরে থাকিনে—

লোকটি কপালে হাত ঠেকাইয়া সেলাম করিল। কহিল—চিনলাম। তোমার বাড়িতে আমরা যাব, একখানা দরখাস্ত লিখিয়ে নিতে। এই আমাদের যত দুঃখধান্ধার কথা ভাল করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে··· ভাল করে লিখলে মহারাণী ঠিক শুনবে—একটা ভাল জলপথ করে দিয়ে যাবে। যাবে না?

৮

নিরক্ষর গ্রাম্য চাষী আমাকে হয়ত মহারাণীর জ্ঞাতিগোত্র ঠাওরাইয়াছে। যে যাহা ভাবুক, আমার ক্ষমতার দৌড় আমি ত বুঝি—হাঁ-না কিছুই না বলিয়া কেবলমাত্র ঘাড় নাড়িয়া হাঁটিতে সুরু করিলাম। পিছন হইতে শুনিলাম, লোকটি বলিতেছে —যদি দরখাস্ত না শোনে জোর করে ঐ পোল ভাঙব, তারপর জেল ফাঁস যা হয় হবে—

দশ বছর পরে বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া সে বাড়ি আর চিনিতে পারি না। উত্তর দালানের ছাত খসিয়া পড়িয়াছে, সিঁড়ির ঘরের মাথায় প্রকাণ্ড আকাশভেদী অশ্বত্থগাছ, ভিতরের উঠানে একহাঁটু উঁচু ঘাস। ঘনশ্যাম গাঙ্গুলী দাখিলা লিখিতেছিল—হিসাব ফেলিয়া হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল—ও দিকে যাবেন না, ওদিকে যাবেন না—পরশু ঐ ঘাসের মধ্যে কেউটে সাপের খোলস পাওয়া গেছে—। সঙ্গের মুটেটাকে ডাকিয়া কহিল—হাঁ করে দেখছিস কি বেটা? ঐ চামড়ার বাক্স-টাক্স কাছারীঘরে এনে রাখ—

কাছারী ঘরখানির অবস্থা ভালই বলিতে হয়।

বাঁশের খুঁটি, চাঁচের বেড়া। সারি সারি তিনখানা তক্তাপোষ তার উপর সতরঞ্চি পাতিয়া ফরাস করা হইয়াছে। ডাবাহুঁকা হুঁকা-

দান,—ত্রুটী কিছু নাই। পাশেই রান্নাঘর। পিছনে জঙ্গলে ভরা বৃহৎ বাড়িটার সহিত সদরের কাছারী বাড়ির কোন সম্পর্ক নাই।

ঘনশ্যাম অর্থ টা সমঝাইয়া দিল। বলিল—দরকার কি? অতবড় বাড়ি মেরামতী অবস্থায় রাখা আর ঐরাবত হাতী পোষা এক কথা। ও বছর কর্ত্তাবাবু এসে মেরামতের কথা বললেন, আমি বললাম—এখন কাজ নেই, আপনারা যদি কখনো দেশ-ভূঁয়ে আসেন তখন সে-সব। ঘোড়া হলে চাবুকের জন্ম আটকাবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কেমন আছ নায়েব মশায়?

ঘনশ্যাম বলিল—আছি ভাল আপনাদের দয়ায়। মাছটা খুব মিলছে আজকাল, জিনিসপত্তোরও সুবিধে। জন-মজুর ভারী সস্তা,—দু আনায় সমস্ত দিন খাটছে। আগে খোসামোদ করতে করতে প্রাণ যেত—এখন বাবা পায়ে ধর আর কাজে লাগ। কোন বেটার ঘরে কিচ্ছু নেই—

—বিলে চাষ বন্ধ বলে বুঝি?

ঘনশ্যাম বলিল—তা ছাড়া আর কি। বেঁচেছি মশায়—ছোট লোকের ঘরে পয়সা হলে রক্ষা আছে? বিল যে আর ইহজন্মে উঠবে তারও কোন ভরসা নেই। বলিয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

বলিলাম—তা হলে প্রজাদের চলবে কি করে?

—না চলে, উঠে যাক।—যাচ্ছেও। অত বড় পূব পাড়ার মধ্যে একলা রাইচরণ আর তার দুটা ভাইপো টিম-টিম করছে। ওরাও যাবে

শিগ্‌গির—ভিটেয় থেকে কি নোনা জল খেয়ে থাকবে? সেবার পঁচিশ শ টাকা গুণে দিয়ে আমাদের এষ্টেটে পঁচিশ বিঘা জমি মৌরশী নিয়েছিল মশায়, আষাঢ় মাসে এসে বলে—নায়েব মশায়, খাওয়া জুটছে না—ছেলে-পিলেগুলো শুকিয়ে মরছে—চোখের উপর আর দেখতে পারিনে। মনটা আমার বড্ড নরম, শুনে কষ্ট হ'ল। বললাম—এক কাজ কর রাইচরণ, এই পঁচিশ বিঘে বরং বাবুদের এষ্টেটে ফের বেচে ফেল—দশ টাকা হিসেবে বিঘে, আড়াই শ টাকা পাবি।

আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম—আড়াই হাজারে কিনে আড়াই শ টাকায় বিক্রী—রাজী হলো?

নায়েব অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল—না, রাজী হয় নি—উল্টে দল পাকাচ্ছে। কিন্তু তাই বা দেয় কে? জলে-ডোবা জমির দাম আছে' কিছু? ওদের এখন ঘরপোড়া ছাই—যা পায় তাই লাভ। বোঝে না বেটারা—

—আমাদেরই বা ঐ জমি কিনে কি হবে?

ঘনশ্যাম আমার অজ্ঞতায় অবাক হইয়া খানিকক্ষণ কথাই বলিতে পারিল না। শেষে বলিল—লাভ নয়? বলেন কি? —আমরা ত এ-ই চাই। সমস্ত চক এমনি করে আস্তে আস্তে খাস করে নেব। তারপর গোটা বিলটা জেলেদের কাছে বিলি হবে। জলকরে সুবিধে কত মশায়! প্রজা-বেটাদের নানান আবদার—আজ বাঁধ ভাঙল, কাল নোনা লেগেছে—হেনো কর তেনো কর—। এখন কিচ্ছু

হাঙ্গাম নেই—বছর অন্তর জেলের কাছ থেকে কর্‌করে টাকা একসঙ্গে গুণে নেও—তারা জাল ফেলুক—ব্যস্‌!

চুপ করিয়া রহিলাম। বুঝিলাম, পুঁটিমারীর বিল-ডুবি হওয়ায় জমিদারের কিছু লোকসান নাই। মরিতে মরিবে অভাগা প্রজারা। সাতপুরুষের ভিটা ছাড়িয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে দেশান্তরে চলিয়া যাইবে।

ঘনশ্যামের কৃতিত্বের কাহিনী তখনো শেষ হয় নাই। বলিতে লাগিল —শুনি, ঐ রাইচরণ নাকি গোপনে দল পাকাচ্ছে। ওরা ভাবে আমরা চেষ্টা করলে বিলের জল-পথটা বড় করে দিতে পারি। আরে বাপু, পারি ত পারি—আমরা তা করতে যাব কেন! যা আছে তাতে আমাদের গরলাভটা কি? দল পাকানো হচ্ছে, কোন জেলেকে বিলের মধ্যে জাল নামাতে দেবে না—দাঙ্গা-ফ্যাসাদ বাধাবে। তা হলে নাকি আমাদের গরজ হবে। বলিয়া হা-হা করিয়া আর এক ঝলক হাসিয়া লইল। বলিল—জমিদারীর কাজে চুল পাকিয়ে [illegible], দাঙ্গা-হাঙ্গামায় কি আমরা পিছপাও? বোঝে না বেটারা—

আমি বলিলাম—না, কোন হাঙ্গামা না বাধলেই ভাল।

ঘনশ্যাম কহিল—কিছু ভাববেন না, আপনি কেবল চুপ করে বসে বসে দেখুন না। এখনো জানে না, ঘনশ্যাম গাঙ্গুলী লোকটা কে। ঐ রাইচরণের গুষ্টিশুদ্ধ দেশছাড়া করব না? টিঁকবে ক'দিন? দেখুন গিয়ে এতক্ষণ আপনার রজনী পাইক উঠোনে গিয়ে বসে আছে ঠিক—

বলিয়া একটুখানি থামিল। আবার দম লইয়া বলিতে লাগিল—এদিকে বেটা আবার বলে, আমরা মানী ঘর—মান রেখে কথাবার্ত্তা না বললে চলবে না। না যদি চলে—বেশ ত, বাস ওঠাও; সোজা পথ দেখা যাচ্ছে—থাকবার জন্তে পায়ে ধরে খোসামোদ কে করছে বাপু? আমরাও ত তাই চাই। পরশু দুপুরে হয়েছে কি—রজনী ত ওর দাওয়ায় চেপে বসেছে, রাইচরণ বাড়ি নেই—ছেলে দুটো ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে। বোঝা গেল চাল বাড়ন্ত। ভারী রসিক আপনার কাছারীর পাইক ঐ রজনী। জানে সব, তবু বলে—খাজনার টাকা দেও, নইলে উঠছি নে। আর নয় ত নতুন হাঁড়ি বের কর—চাল আন—ডাল আন—সিধে সাজাও—যে ক'দিন টাকা না পাব তোমাদের বাড়ি অতিথ হয়ে থাব। তিনটে গোলা আছে—তিন বেলা তিন গোলার ধানের চাল। চাষা লোকের মেয়ে হ'লে কি হয়, রাইচরণের বৌটার বুদ্ধি খুব। খোঁটাটা বুঝতে পারলে, চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল পড়তে লাগল।—

দিন পাঁচ সাত কাটিয়া গেল। ভালই কাটিল, নায়েব মহাশয়ের আয়োজনের ক্রটী নাই। পুঁটিমারীর বিল হইতে সকালে বিকালে ঝড়ি ঝড়ি টাটকা মাছ আসিতেছে, গঞ্জ হইতে দাদখানি চাউল। দুধেরও অপ্রাচুর্য্য নাই। দুপুরে খাইতে বসিয়াছি, ঘনশ্যাম লোনা ও মিঠা

জলের মাছের আস্বাদের তুলনা করিতেছে। হঠাৎ বিশ ত্রিশ জন লোক ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে কাছারিবাড়ির উঠানে দৌড়িয়া আসিল।

খুন! খুন! খুন!

খাওয়া ঐ পর্য্যন্ত। দেখিলাম, বড় বিপদের মধ্যেও ঘনশ্যাম বিচলিত হয় না।

—খুন কিরে? কে কাকে খুন করলে?

—রজনীকে। রাস্তায় লাস পড়ে আছে—রাইচরণ আর তার ভাইপোরা সড়কী মেরেছে। কাছারী নাকি লুট করতে আসছে—

ঘনশ্যাম তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল—আসুকগে। বেটাদের বড় বাড় হয়েছে—আচ্ছা। আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—কিছু ভাববেন না, বিছানা পাতা আছে—বিশ্রাম-টিশ্রাম করুন গিয়ে। আমি লাসটা নিয়ে আসি।—

জন কয়েক ধরাধরি করিয়া রজনীকে লইয়া আসিল। চক্ষু মুদ্রিত। তাজা রক্তে কাপড়-চোপড় ও সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া গিয়াছে—এক এক জায়গায় রক্ত চাপ বাঁধিয়া লাগিয়া রহিয়াছে। হাঁটুর নীচে হইতে তখনও রক্ত গড়াইয়া গড়াইয়া কাছারী ঘরের দাওয়ার উপর পড়িতে লাগিল। এমন দৃশ্য আর দেখি নাই। আপাদমস্তক হিম হইয়া গেল, মনে হইল মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইব।

হঠাৎ দেখিলাম, লাসটি কথা কহিতে কহিতে দিব্য উঠিয়া বসিল যাক, মরে নাই তবে!

ঘনশ্যাম কহিল—তবু ভালো যে মরিস নি, তা হ'লে সাক্ষী পাওয়া মুস্কিল হ'ত—

রজনী হাত দিয়া ক্ষত মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল—ওরা তাক করতে পারে নি। পায়ে সড়কী মারলে কখনো ঘায়েল হয়? দিতে পারত আর খানিক উঁচুতে তলপেটে বসিয়ে। আমি নিজেই হয়ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে একরকম চলে আসতে পারতাম নায়েব মশায়, কিন্তু চোখ বুঁজে পড়ে রইলাম; লোকের হৈ চৈ শুনে কেমন ভয় ধরে গেল।

কত-কি গাছ-গাছড়া শিলে বাটিয়া ক্ষতমুখে লাগাইয়া দেওয়া হইল। এমনি ঘণ্টা খানেক চলিল। রক্ত বন্ধ হইল। রজনীর ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, এত কম আঘাতে উহারা কাবু হয় না।

অতঃপর ঘনশ্যামের মোকর্দ্দমা সাজাইবার পালা। জিজ্ঞাসা করিল —ঘটনাটা কি রে?

রজনী কহিল—এমন কিছু নয়, আপনার হুকুমমত গিয়ে বললাম—আজ যদি কাছারী না যাস রাইচরণ, কান ধরে ঘোড়দৌড় করিয়ে নিয়ে যাবার হুকুম। রাইচরণ বল্লে—তুমি একটু দাঁড়াও, কাপড়খানা ছেড়ে দুটো টাকা গাঁটে করে আসি—কাছারীতে বাবু এসেছেন, তাঁর নজরানা। আমি গাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাক খাচ্ছি, হঠাৎ পেছন থেকে সড়কী বসিয়ে দিলে—

সমস্ত বিকাল ধরিয়া কতলোক যে আসাযাওয়া করিতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি নির্লিপ্তের মতো একদিকে চুপ করিয়া

বসিয়া রহিলাম। ঘনশ্যাম পরামর্শ আঁটিতে লাগিল, সাক্ষী সাজাইতে লাগিল, আবার জেরা করিয়া তাহাদের ভুল ধরাইয়া দিতে লাগিল। মুখের প্রসন্নতা দেখিয়া সন্দেহ রহিল না, রাইচরণকে লইয়া অনতি-বিলম্বে ভয়ঙ্কর কাণ্ড সুরু হইবে। সন্ধ্যার আগে ঘনশ্যাম কহিল—এইবার ব্রহ্মাস্ত্র তৈরী হয়ে গেল, আমি থানায় চল্লাম। খবর পাচ্ছি—বেটারা ভয়ানক ক্ষেপে গিয়েছে, রাত্রিবেলা কাছারী এসে একটু হৈ-চৈ করতে পারে। আপনি সাবধান হয়ে থাকবেন—কিছু ভয় নেই—

পাহারার জন্য ঘনশ্যাম গোপন ব্যবস্থা যদি কিছু করিয়া গিয়া থাকে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রকাশ্যতঃ ফরাসের উপর বসিয়া রহিলাম কেবল মাত্র আমি এবং নীচে খোঁড়া পা লইয়া রজনী পাইক। সন্ধ্যার পরেই কেবল কাছারীবাড়িতে নয়, সমস্ত গ্রামের মধ্যে মানুষের সাড়া একদম বন্ধ হইয়া গেল। দুপুরে তাজা নররক্তের যে প্রবাহ দেখিয়াছি অন্ধকারের মধ্যে যেন তাহার বিভীষিকা দেখিতে লাগিলাম। ঘরের সামনেই আমকাঁঠালের ঘন বাগান। এক একবার মনে হইতে লাগিল, সড়কী বল্লম লইয়া কাহারা যেন পা টিপিয়া টিপিয়া উহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া নিঃশব্দে আমার ঘরের কানাচের দিকে আসিতেছে। হেরিকেনটা সত্যসত্যই একবার উঁচু করিয়া দেখিয়া লইলাম। দুয়ার খোলা, রজনী তাহার নিকটেই বসিয়াছিল। দুয়ারটা ভেজাইয়া দিতে

বলিলাম। রজনী খোঁড়া পায়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া খিল আঁটিয়া দিল, কারণ জিজ্ঞাসা করিল না। বোঝা গেল, ভয় কেবল আমার একার নহে। মেঘ করিয়া চারিদিক এত আঁধার করিয়াছে যে এরূপভাব আমার জন্মে দেখি নাই। এই অন্ধকার রাত্রিতে বিদ্রোহী রাইচরণের দল নিশ্চয় চুপ করিয়া বসিয়া নাই, এমনি আশঙ্কায় গা ছমছম করিতে লাগিল। ঘনশ্যাম সেই যে থানায় গিয়াছে এখনো ফেরে নাই। রান্নাঘরে আলো নিবানো। যে লোকটা রান্না করিয়া থাকে সে এই দুর্যোগে হয়ত আসে নাই, কিংবা আসিয়া থাকে ত ইতিমধ্যে কোন গতিকে কাজ সারিয়া খিল আঁটিয়া দিয়াছে। রজনী তামাক সাজিয়া আপন মনে টানিতে লাগিল। যা হোক কিছু কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য বলিলাম—ও রজনী, রাইচরণের পশ্চিম ঘরের কানাচে যে রাস্তা—কাণ্ডটা ঘটল বুঝি সেখানে?

রজনী উত্তর করিল না, যেন শুনিতেই পাইল না।

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—রাইচরণ কি বল্লে? কাছারীতে বাবু এসেছেন, তাঁর নজরানা নিয়ে যাচ্ছি—এই না?

রজনী মুখ ফিরাইয়া বাহিরের দিকে ইসারা করিয়া চুপি চুপি কহিল—ওসব কথা থাকগে এখন বাবু, রাতবিরেতে দরকার কি? কে কোথায় ওৎ পেতে বসে আছে, তার ঠিক নেই—

কথা শুনিয়া সর্ব্বদেহে কাঁটা দিয়া উঠিল। ইহা সম্ভব বটে। আমি যেখানে বসিয়া আছি তাহার পাশে একটি চাঁচের বেড়ার ব্যবধানে

হাত তুয়েকের মধ্যে হয়ত সেই খুনে লোকেরা ঢাল-সড়কী লইয়া দল বাঁধিয়া নজরানা দিতে বসিয়া আছে। দশ বছর পরে পাড়াগাঁয়ে পা দিয়াছি, দশ বছর আগেকার যে-সব দিনের অস্পষ্ট স্মৃতি এখনো মনের মধ্যে আছে, সে সময়ে মানুষ এমন করিয়া মানুষের রক্তপাত করিত না। তখন দেখিতে পাইতাম, ক্ষেত চষিবার ও গোলা বাঁধিবার ভীষণ প্রতিযোগিতা। পেটে খাইতে যে পয়সা খরচ হয় এ বোধ কাহারও ছিল না। আমাদের বাড়ীতেই দেখিয়াছি—উনুনে সমস্ত দিন অনির্ব্বাণ রাবণের চিতা জলিতেছে। সেজজেঠাকে কালোয়াতী রোগে ধরিয়াছিল, পাখোয়াজ ঘাড়ে করিয়া ক্রোশ দুই দূরে মাদারডাঙায় চলিয়া যাইতেন। রাত্রি দুপুর হইয়া যাইত, কোন দিন মোটে ফিরিতেন না, আবার কোন কোন দিন একেবারে জন পাঁচ সাত জন সঙ্গী লইয়া হানা দিতেন। তখন হয়ত ঠাকুরমা, ন'পিসি, জেঠাইমা'রা সকলে শুইয়া পড়িয়াছেন। আবার উঠিয়া ভাত চাপাইতে হইত, মুখে একটু বিরক্তভাব কখনও দেখি নাই। বাড়িতে লোক আসিয়াছে, রাঁধিয়া বাড়িয়া খাওয়ানো—ইহা ত মস্ত আনন্দের কথা। এখনকার রীতি নীতি দেখিয়া অনেক সময় সন্দেহ হয়, হয়ত উহা কবে একদিন ছেলেবেলায় স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম—উহার কোন সত্য অস্তিত্ব নাই। পরক্ষণে আবার তাকাইয়া তাকাইয়া দেখি, কান্তরামের বড়ছেলের কুড়েঘরের পাশটিতে জঙ্গলে ভরা সারি সারি পাঁচটি গোলার ভিটা নিবন্ত পঞ্চপ্রদীপের মতো এখানা পড়িয়া আছে। তখন মনে হয়—না, মিথ্যা নয়—উহা সত্য, সত্য!

বেড়ার ফাঁকে নজরে পড়িল, রাস্তার উপর একটি আলো।

—কে? ও কে? কথা বল না কেন?

কেবলি প্রশ্ন করিতেছি, কিন্তু উত্তর দিতে যেটুকু অবকাশের প্রয়োজন তাহা দিতেছি না। রজনীও উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমার সহিত সমস্বরে প্রশ্ন সুরু করিল। আলো নিরুত্তরে আসিয়া কাছারীর দাওয়ায় উঠিল; তারপর বলিল—রজনী, দুয়োর খোল্।

ঘনশ্যামের কণ্ঠস্বর। যাক, রক্ষা পাইলাম।

সঙ্গে আর কাহারা আসিতেছিল। তাহাদের উদ্দেশে ঘনশ্যাম বলিল—তোরা বাপু বাড়ি যা—আর দরকার নেই। তারপর গলাটা নামাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—অত চেঁচামেচি করছিলেন কেন? রাহাজানি করতে আসে কি হেরিকেন জ্বেলে সন্ধ্যাবেলায়?

তা বটে। ভাবে বোঝা গেল—বেশ জোর পায়েই ঘনশ্যাম চলিয়া আসিয়াছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া জিরাইয়া লইল, তারপর রজনীর দিকে চাহিয়া কহিল—তুই বেটা এরি মধ্যে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিস যে! মোকর্দ্দমার অসুবিধে হবে। হাঁসপাতালে শুয়ে থাকতে হবে নিদেন-পক্ষে তিনটি মাস। সেই রকম এজাহার লিখিয়ে দিয়ে এলাম। বলিয়া হঠাৎ যেন কি মনে পড়িয়া গেল—রজনী, একটু বাইরের দিকে গিয়ে বস ত—

হুকুম তো হইয়া গেল, কিন্তু আজিকার রাত্রে বাহিরে গিয়া বসা যে-সে কর্ম্ম নয়। একবার সড়কীর তাক ফস্কাইয়া পায়ে আসিয়া

বিঁধিয়াছে, বারান্তরে উহারা ভুল সংশোধন করিয়া লইবে না তাহার নিশ্চয়তা কি ? অথচ মুস্কিল এই, এতবড় কাছারীর পাইকের পক্ষে ভয়ের কথাটা মুখ ফুটিয়া বলা চলে না। রজনী যেমন বসিয়াছিল, তেমনি রহিল।

ঘনশ্যাম হুঙ্কার দিয়া বলিল—বেটা শুন্‌তে পাস নে ? বলছি, একটা গোপন কথা আছে—

নিতান্ত মরীয়া হইয়া রজনী ডানহাতে লইল একখানা লাঠি, তারপর অতি সন্তর্পণে ওদিক ওদিক তাকাইয়া দাওয়ার কোণে গিয়া বসিল।

ঘনশ্যাম ফিস-ফিস করিয়া কহিল—এই ইয়ে—টাকা কড়ি যা আছে একটা থলিতে ভরে কোমরে বেঁধে ফেলুন, গতিক বড় সুবিধের নয়।—বুঝলেন ? কাগজ-পত্তোর যা কিছু, গোলমাল দেখে অনেক দিন আগেই সরিয়ে ফেলেছি। তারপর ধাঁ করিয়া গলা একেবারে সপ্তমে চড়িল।—থানায় গিয়ে দেখি ভোঁ—ভোঁ—ছোট দারোগা বড় দারোগা দুজনেরই পাত্তা নেই সকাল থেকে। ট্রেন-ঘরা ডাকাতির কেসে গিয়েছে। বিল-ডুবি হয়ে বেটারা যেন সিংহীর পাঁচ-পা দেখেছে—কেবল খুনজখম চুরিডাকাতি। টের পাবে—'পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে—'

কবিতার একচরণ আবৃত্তি করিয়াই চুপ করিল। খানিক পরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া আমি কহিলাম—রাত অনেক হয়েছে, খেয়ে দেয়ে এবার শোবার ব্যবস্থা হোক—ঘুম পাচ্ছে—

ঘনশ্যাম তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিল—

—না, সকাল সকাল শুতে হবে—দেরী করে কাজ নেই। সকাল থেকে আবার খাটনী সুরু। একসঙ্গে একেবারে বিশখানা ওয়ারেন্ট বের করে দিয়ে এলাম। রাত না পোহাতেই বন্দুক-টন্দুক নিয়ে পুলিশ আসবে। তখন এক এক বাড়ী ঘেরাও কর, আর মেয়ে-মর্দ্দ ধরে ধরে চালান দেও। সড়কী-মারা বের করে দিচ্ছি—ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেন নি।

চোখ টিপিয়া ইসারায় আমাকে বলিল—আশে পাশে যদি কেউ থাকে তো শুনে যাক—ভয়ে হাত-পা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে যাবে।

রজনী আসিয়া ঘরে ঢুকিল, তাহার মুখ পাংশু। অন্ধকারের দিকে আঙুল বাড়াইয়া বলিল—নায়েব মশায়, মানুষ—আশ্‌শ্যাওড়ার বন ভেঙে মড়মড় করে চলে গেল।

আমি কহিলাম—শেয়াল-টেয়াল হবে, তোমার ভয় লেগেছে রজনী, তাই ঐ রকম ভাবছ। তুমি ঘরের মধ্যে এসে বসো—

ঘনশ্যাম মৃদুস্বরে বলিল—যাই হোক, এখন আর রান্নাঘরে গিয়ে কাজ নেই—ঘরের বেড়াটা তেমন সুবিধে না। এক রাত না খেলে আর কেউ মরে যায় না। গেল বছর কি হল—সাতবেড়ে কাছারীতে ম্যানেজার কালীচরণ শিকদার এলেন তদারক করতে। ভদ্রলোক কেবল মাছের ঝোলের বাটী টেনে নিয়ে বসেছেন—গুড়ুম করে এক গুলি। দিন দুপুরে এত বড় কাণ্ড—অথচ খুনের মোটে আস্কারাই

হ'ল না। সব প্রজা একজোট কিনা—

শুনিয়া আর ক্ষুধা রহিল না। বলা ত যায় না, রান্নাঘরে যদি রাইচরণ নজরানা লইয়া দেখা করিতে আসে। এদিকে কোথাও কিছু নয়, ঘনশ্যাম আরম্ভ করিল বিষম চেঁচামেচি—

—ওরে বেটা উজবুক, হাঁ করে বসে রইলি যে! সমস্ত রাত এইরকম কাটবে নাকি? তুই না পারিস আর কাউকে বল। ফরাসের উপর ছুটো তোষক পেতে দিক। আলনার পরে চাদর আছে, বাবুর বিছানার উপর পেতে দে—আমার লাগবে না। আর ছুটো কাঁথা দিস, রাত্তিরে বিষ্টি হলে শীত লাগতে পারে—

বলিয়া কিন্তু কাহারও অপেক্ষা না করিয়া ঘনশ্যাম নিজেই চটপট সমস্ত পাতিয়া লইল। তুইজনে শুইয়া পড়িলাম। পরক্ষণেই আবার উঠিয়া আলো নিভাইয়া দিল।

বলিলাম—আলো জ্বালা থাকলেই ভাল হত।

ঘনশ্যাম কহিল—না, আর তেল পোড়ায়ে লাভ কি? বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

ইহার পর বোধকরি ঘণ্টা দেড়েক কাটিয়া থাকিবে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুম বেশ জমিয়া আসিয়াছিল। হঠাৎ গলার উপর মানুষের হাতের শীতল স্পর্শ। একমুহূর্ত্তে ঘুমের মধ্যেও সারাদিনের আতঙ্ক মাথা খাড়া করিয়া উঠিল। রাইচরণের দল ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গলা কাটিতে আসে নাই ত? চীৎকার করিতে যাইতেছিলাম, এমন সময়

ঘনশ্যাম আমার মুখের উপর হাত চাপিয়া চুপি চুপি কহিল—আমি—আমি—ভয় পাবেন না। উঠুন তো।

উঠিয়া বসিলাম। অন্ধকারে তাহার চোখ দুটা যেন জ্বলিতেছে, হাতে লম্বা সড়কী। বলিল—এখানে শোওয়া হবে না। বেটারা হন্তে কুকুরের মতো ক্ষেপে গেছে, রাত্রে কি করে বসে তার ঠিক নেই। চলুন—

আবার চলিতে হইবে—বলে কি! ঘুম উড়িয়া গেল। ভগবান, কাহার মুখ দেখিয়া যে এই জংলী পাড়াগাঁয়ে মরিতে আসিয়াছিলাম! এই ঘনান্ধকার বর্ষারাত্রে না জানি কোথায় যাইতে হইবে!

ঘনশ্যাম বলিতে লাগিল—উঠুন, অসুবিধে কিচ্ছু নেই—বেশ ভাল জায়গা দেখা আছে। এ গ্রামে কাউকে বিশ্বাস করিনে, কোন বেটার মনে কি আছে কে জানে? যাব একেবারে বাঁকাবড়শী নীলাম্বর বিশ্বেসের বাড়ী। আবার ঘোর থাকতে ফিরে এসে শোব—কাক-পক্ষীতে টের পাবে না।

বাঁকাবড়শী গ্রাম আমার চেনা, অনেক বৈঁচির জঙ্গল আছে। ছোটবেলায় বৈঁচির ফল খাইতে খাইতে একদিন ততদূর অবধি চলিয়া গিয়াছিলাম। বলিলাম—বাঁকাবড়শী ত অনেক দূর—

ঘনশ্যাম বলিল—কোথায় দূর! মোটে আধ ক্রোশ পথ। খাল পার হ'তে হবে—তা মজবুত সাঁকো বাঁধা আছে—অসুবিধে কিছু নেই—

না থাকিলেই ভাল। আর সে বিবেচনা করিবার অবসরই বা কোথায়? জুতা পায়ে দিতেও ঘনশ্যামের আপত্তি, বলিল—উঁহু, শব্দ হবে। কে কোথায় ওৎ পেতে বসে আছে—কাজ কি? দাঁড়ান—

বলিয়া একটা পাশের বালিশ আমার শিয়রের বালিশের উপর শোয়াইল, সযত্নে তাঁহার উপর কাঁথা চাপা দিল। অন্ধকারে দেখিতে পাইতেছিলাম না, কিন্তু বিছানার ঠিক পাশে বসিয়াছিলাম বলিয়া সমস্ত টের পাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—এ আবার কি ঘনশ্যাম?

ঘনশ্যাম কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল—এ মতলব থানা থেকে আসবার পথেই ভেবে রেখেছি। ঐ যে হৈ-চৈ করে সজনী পাইককে বিছানা করতে বল্লাম, সব তার মানে আছে, মশায়। আশেপাশে চর-টর যারা আছে, শুনে গিয়ে খবর দিক। কাঁথা-চাপা পাশবালিশ রইল, রাত্রে ঘরে ঢুকে কোন বেটা যদি কোপ-টোপ ঝাড়ে, কি বেকুব হবে বলুন তো। কালকে এসে হয়তো দেখব, বালিশটা দুইখণ্ড হ'য়ে আছে।

স্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, শত্রুর সম্ভাবিত বেকুবীতে ঘনশ্যাম ভারী খুসী হইয়াছে।

নিঃশব্দে সে দরজা খুলিল, আমি পিছনে পিছনে চোরের মতো বাহির হইয়া আসিয়া দরজায় শিকল লাগাইলাম। টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে সুরু হইয়াছে; কোথাও হাঁটু অবধি কাদা, জায়গায় জায়গায় জল বাধিয়া রহিয়াছে, জল ছিটকাইয়া একেবারে মাথা অবধি

উঠিতেছে। সে যে কি দুঃখের যাত্রা, মনে করিলে এখনও কান্না পায়। খালি পা, অন্ধকারে ছাতা খুঁজিয়া পাই নাই ;. তার উপর ঘনশ্যাম ফাঁকা রাস্তা দিয়া চলিতে দিবে না, তাহাতে আততায়ীর নজরে পড়িবার সম্ভাবনা। বনজঙ্গল. ভাঙিয়া অতি সন্তর্পণে চলিতে লাগিলাম। রক্ষার মধ্যে অন্ধকারে ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি খুলিয়া গিয়া ঘনশ্যামের অস্পষ্টমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছিলাম। কোথা দিয়া কোনখানে যাইতেছি তাহার কিছুই আন্দাজ ছিল না, কেবল কোন গতিকে উহার পিছন ধরিয়া চলিয়াছিলাম। এক একবার সে স্থির হইয়া দাঁড়ায়, চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লয়, আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করি—কি ? কোন কিছু দেখতে পাচ্ছ নাকি ? ঘনশ্যাম জবাব দেয়—না, চলুন— আবার অগ্রসর হইতে থাকে। হঠাৎ একবার পিছনে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—সর্ব্বনাশ, শুধু হাতে আসছেন নাকি ? শিগ্‌গির একটা জিওলের ডাল ভেঙে নিন—শিগগির—

ক্রমে খালের ধারে পৌছিলাম। মেঘ ও অন্ধকার আবার এত জমিয়া আসিল যে ঘনশ্যামকেও আর দেখা যায় না। অতঃপর চোখ দিয়া দেখিয়া নয়—পা দিয়া স্পর্শ করিয়া বুঝিলাম, বাঁশের সাঁকোর উপর উঠিয়াছি। একখানি মাত্র বাঁশ, পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার উপর দিয়া যাইতেছি, হাতে ধরিবার জন্য আর একখানি বাঁশ উপরে বাঁধা আছে। দুইটা মানুষের ভারে বাঁশ মচ-মচ করিতে লাগিল, বুঝি বা সবশুদ্ধ ভাঙিয়া চুরিয়া নিশীথরাত্রে খালের জলে গিয়া পড়িতে

হয়। ঘনশ্যাম ওপারে গিয়া নিঃশ্বাস ফেলিল। বলিল—যাক, নিশ্চিন্ত। খাল পার হয়ে কোন শর্ম্মা আর এদিকে আসছেন না। এই খাল হ'ল আমাদের এলাকার সীমানা—

আবার বলল—এখনো পার হ'তে পারলেন না? তা আসুন—আস্তে আস্তেই আসুন। খুব সাবধান হয়ে ধ'রে ধ'রে আসবেন—বৃষ্টির জলে বাঁশ পিছল হয়ে গেছে। সেদিন একটা লোক এইখান থেকে পড়ে যা দুর্গতি—ভাসতে ভাসতে আর একটু হ'লে বেড়জালের মধ্যে ঢুকে গেছল আর কি—

খাল পার হইয়াও পথ ফুরাইল না। কত পথ চলিলাম জানি না, শেষে বাঁশের বেড়া ডিঙাইয়া এক গৃহস্থের বাহিরের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ঘনশ্যাম বলিল—নীলাম্বর বিশ্বাসের বাড়ি।

তবু ভাল। ভাবিয়াছিলাম, তাহার ঐ আধ ক্রোশ পথ চলিতে বুঝি সমস্ত রাত্রিতেও কুলাইবে না।

ঘনশ্যাম বাহিরের আল্‌গা বড় ঘরখানির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু পা দিয়াই চক্ষের নিমেষে নামিয়া পড়িল। যেন সাপ দেখিয়াছে। এদিকে কাদায় বৃষ্টিতে সমস্ত কাপড় চোপড় মাখামাখি, মাথা দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে, একটুখানি আশ্রয় পাইলে বাঁচিয়া যাই। আবার নামিয়া আসিতেছে দেখিয়া বিরক্তি ধরিল, সারারাত এমনি করিয়া ঘুরাইয়া বেড়াইবে নাকি? এমন দগ্ধিয়া মরার চেয়ে সড়কীর আঘাতে প্রাণ দেওয়া যে ঢের ভাল ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হ'ল?

জবাব দিল—এখানে হবে না—এ ঘরে কেউ শোয় না বলে জানতাম। আজ দেখছি এক পাল মানুষ—

আমি কহিলাম—হোক গে। মানুষ শুয়েছে—বাঘ তো নয়। তুমি ওদের ডেকে বল। দু'জনে একটা রাত মাথা গুঁজে পড়ে থাকব—তা দেবে না? যেখানে হয় শুয়ে পড়ি—

ঘনশ্যাম মাথা নাড়িয়া কহিল—তা হয় না। ডেকে তুল্‌ব কি মশায়, হঠাৎ যদি কেউ জেগে উঠে আমাদের দেখে ফেলে তা হ'লে সর্ব্বনাশ, তা বুঝছেন না? কাল যদি এ অবস্থা জানাজানি হয়ে যায়, এ অঞ্চলে কোনও বেটা আর মানবে? চলুন, আর এক বাড়ি যাই। এবারে ফিরব না, এবারে নির্ঘাৎ—

হায় ভগবান!

ঘনশ্যাম বলিল—দূর নয়, কাছেই। আধ ক্রোশও হবে না—উঠুন।

ফের আধ ক্রোশ! আধ ক্রোশের কথা শুনিয়া শুনিয়া যে আর পারি না। আমি ছাঁচতলায় বসিয়া পড়িয়াছিলাম, মরীয়া হইয়া বলিলাম—নায়েব মশায়, আর এক পাও যাচ্ছিনে। যা থাকে কপালে এখানে হ'য়ে যাক। কোথাও না জোটে এই উঠোনেই শুয়ে পড়ব। কার মুখ দেখে যে কাশী থেকে বেরিয়েছিলাম।

ঘনশ্যাম চিন্তিত হইল। কহিল—ভারী মুস্কিলেই ফেল্লেন। কি করা যায়, তাই তো···আচ্ছা দেখি—বলিতে বলিতে অন্ধকারে অদৃশ্য

হইয়া গেল। একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল—আসুন, হয়েছে—

জিজ্ঞাসা করিলাম—আর কতদূর ?

—এই বাড়িতেই—নিতান্ত মন্দ হবে না।

ঢুকিতে হইল গোয়ালঘরে। গোরু এবং বাছুরে ঠাসাঠাসি, তিল ফেলিলেও বোধ হয় স্থানাভাবে গোরু-বাছুরের গায়ের উপরে রহিয়া যাইবে। এবং গোবর ও গোমূত্র সহযোগে মেজের উপর এমন গভীর সুপবিত্র কর্দ্দমের সৃষ্টি হইয়াছে যে তাহার মধ্যে কোথায় যে শুইতে হইবে ভাবিয়াই পাইলাম না।

কিন্তু শুইবার জায়গা ঠিক হইয়াছে নীচে নয়—উর্দ্ধলোকে।

আড়ার উপরে বর্ষার জন্য সঞ্চিত শুকনা বাঁশের চেলাকাঠ সাজানো, ঘনশ্যাম অবলীলাক্রমে খুঁটি বহিয়া তাহার উপরে উঠিল ; আমাকে কহিল—হাত ধরুব নাকি ?

হাত আর ধরিতে হইল না। স্বর্গারোহণ করিলাম। দেখি, সেখানেও সুখের অতি উত্তম ব্যবস্থা। মশা ভন-ভন করিতেছে, পিছনের ডোবা হইতে কোলা বেঙের একটানা আওয়াজ, ফুটা চাল হইতে দু'এক ফোটা বৃষ্টিও যে গায়ে আসিয়া না লাগিতেছে এমন নয়। মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয়, যদি ইহার একখানা বাঁশের চেলা এদিক ওদিক সরিয়া যায় তাহা হইলে এই জীবনে একটা রাতি অন্ততঃ মহাদেব হইয়া গোপৃষ্ঠে চড়িয়া দেখা দিব।

কিন্তু ঘুমাইয়া পড়িতে দেরী হইল না। পরক্ষণে বাঁশ মচ-মচ করিয়া উঠিল। গ্রহের দৃষ্টি বুঝি কাটে নাই, ভাঙিয়া পড়ে নাকি? তাড়াতাড়ি চোখ মেলিয়া দেখি—তাহা নয়, ঘনশ্যাম নামিয়া যাইতেছে।

কহিল—শুয়ে থাকুন, এক্ষুনি ঘুরে আসছি।

জিজ্ঞাসা করিলাম—আবার কোথায়?

—কাছারীবাড়ি। বড্ড একটা ভুল হয়ে গেছে। যাব আর আসব। আপনি স্বচ্ছন্দে শুয়ে থাকুন—

ঘুম এমন আঁটিয়া আসিয়াছিল যে আর দ্বিরুক্তি করিলাম না। তারপর আর কিছুই জানি না। জাগিয়া উঠিলাম যখন ঘনশ্যাম হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া ডাকিতেছে—উঠুন, শিগ্‌গির উঠুন, ভোর হয়ে এল। কেউ না উঠতে কাছারীর বিছানায় গিয়ে ভালোমানুষের মতো শুতে হবে—

বাহিরে আসিয়া দেখি, আকাশ পরিষ্কার—মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের শেষাশেষি কি-একটা তিথি। বিগতপ্রায় রাত্রির আকাশে পাণ্ডুর ক্ষীণ চাঁদ উঠিয়াছে। সাঁকোর উপর উঠিয়া ডান হাত দিয়া বাঁশ ধরিতে যাইতেছি, হাতের দিকে নজর পড়িতে চমকিয়া উঠিলাম—এ কি, রক্ত কোথা আসিল? দুপুর হইতে রক্তের বিভীষিকা দেখিতেছি, রাত্রির শেষ প্রহরে মুক্ত বিলের সীমানায় আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্তের আতঙ্কে থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ঘনশ্যাম পিছনে ছিল,

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—ঘনশ্যাম, দেখ, দেখ—আমার হাতে রক্ত এল কোত্থেকে ?

চাহিয়া দেখি, ঘনশ্যামের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। জবাব কি দিবে, তাহারই কাপড়-চোপড়ে যেখানে সেখানে গাঢ় রক্তের মাখামাখি। কি-একটা অস্ফুটভাবে বলিয়া তাহাই সে এক নজরে দেখিতেছিল।

সাঁকো হইতে নামিয়া আসিলাম। কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম—এ কি ? কি করেছ ? আমায় সত্যি কথা বল—

ঘনশ্যামের কথা নাই।

তাহার দুই কাঁধ ধরিয়া প্রচণ্ড নাড়া দিয়া কহিলাম—শুনতে পাচ্ছ ? রাত্তিরে বেরিয়েছিলে—কার সর্বনাশ করে এলে ?

জিভ দিয়া ওষ্ঠ ভিজাইয়া লইয়া কোন গতিকে সে কহিল—ও এমনি—

—এমনি-এমনি আকাশ ফুঁড়ে রক্ত এল ? আজ পাঁচ-ছ'দিন ধরে তোমার কাণ্ড দেখছি। মালিক আমরা, মুনাফা আমাদের—কথা বলতে পারিনে। কিন্তু এর কি সীমা নেই ? কাল পুলিশ এলে আমি নিজে সাক্ষী দিয়ে তোমায় খুনী বলে ধরিয়ে দেব।—বলিতে বলিতে মনে হইল বুঝি বা কাঁদিয়া ফেলিলাম।

ঘনশ্যাম এমনি করিয়া তাকাইল, যেন আমার কথা বুঝিতে পারিতেছে না। কহিল—বাবু, ঠাণ্ডা হন—খুন হ'ল কোথায় যে অমন করছেন ?

—রাত্তিরে উঠে কোথায় বেরিয়েছিলে ? বল—বলতে হবে—

এবারে ঘনশ্যাম বিরক্ত হইল। কহিল—বলেছি ত—কাছারি বাড়িতে। এক-শ বার এক কথা। বলে, যার জন্যে চুরি করি—যাকগে, কর্ত্তা নিজে যদি আসতেন আমার কদর হ'ত। একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল, তাই গিয়েছিলাম। ভুল-চুক কার না হয়, মশায় ?

বলিয়া খালের কিনারায় বসিয়া হাত ও কাপড়ের রক্ত ধুইতে বসিয়া গেল। বলিল— আপনার হাতটাও ধুয়ে ফেলুন, চিহ্ন রাখতে নেই। হাত ধরে আপনাকে ডেকে তুলবার সময় একটুখানি লেগে গেছে। যে ঘুরঘুটি অন্ধকার—আগে টের পাই নি, এত রক্ত লেগেছে।

আমি কিন্তু অমন শান্ত হইয়া বসিয়া হাত ধুইতে পারিলাম না। বলিলাম—ঘনশ্যাম কথাটা ভাঙছ না কেন ? কি করে এলে—বল শিগগির।

ঘনশ্যাম কহিল—ভুল করে ফেলেছিলাম। থানায় এজেহার দিলাম, পাইকের পায়ে সড়কী মেরেছে। দারোগা জিজ্ঞাসা করল—কোন পায়ে ? বললাম—বাঁ পায়ে। শুয়ে শুয়ে মনে হল, বাঁ পায়ে তো নয়—ডান পায়ে। ভাগ্যিস কথাটা মনে উঠল !

কহিলাম—ডান পায়েই তো। আর একটু হলে রজনীর প্রাণটা যাচ্ছিল, ওকে কি চোখ দিয়ে দেখ নি একবার ?

ঘনশ্যাম বলিল—দেখেছিলাম বৈকি। সবই ঠিকঠাক লিখিয়ে দিইছি—কেবল ঐ একটা ভুল। ভুল আর কার না হয় বলুন—তবে বড় মারাত্মক ভুল। সকালে দারোগা আসবে তদন্তে—মামলা ফেঁসে

যাওয়ার জোগাড়। তাই রাত থাকতে থাকতে একবার নিজের চোখে দেখতে গেলাম।

কহিলাম—দেখে কি হ'ল, গোলমাল যা হবার সে ত হয়েছেই—

হঠাৎ ঘনশ্যাম বিনয়ে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িল। কহিল—আজ্ঞে, গোলমাল হবে তো এ অধীন আছে কি করতে? ভাবনা নেই, সব ঠিক করে দিয়ে এসেছি। রজনীর বাড়ি আপনি দেখেন নি। চার পোতায় একখানা মাত্র ঘর, সে ঘরের আবার সামনে বেড়া নেই। সুবিধে হ'ল। গিয়ে দেখলাম, বেহুঁস হয়ে ঘুমুচ্ছে—বৌটাও আর এক পাশে। ঠাউরে দেখি, জখম ডান পায়েই বটে। তখন সড়কী দিয়ে বাঁ পায়ে আবার একটু খুঁচিয়ে দিয়ে এলাম। বাবাগো—বলে যেই চেঁচিয়ে উঠেছে, আমি অমনি সুড়ৎ করে সরে পড়লাম।

বলিয়া নিজের চতুরতায় হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল—একেবারে ডবল সুবিধে। এই নিয়ে রাইচরণের নামে ফের আর এক নম্বর চলবে। এখন বাকী রইল, ডান পা বাঁ পায়ের গোলমালটা। আমি আগে যাচ্ছি রজনীর বাড়ি, দারোগা জিজ্ঞাসা করলে যাতে বলে—দিনে মেরেছিল বাঁ পায়ে, রাতে ডান পায়ে। আজ আর হেঁটে কাছারী আসতে হবে না বাছাধনের—তা শুয়ে শুয়েই সাক্ষী দেবে।

অভিভূতের মত শুনিয়া যাইতেছিলাম।

ঘনশ্যাম কহিল—কই, হ'ল আপনার হাত ধোয়া? চলুন।

কাছারী বাড়ির কাছাকাছি আসিয়াছি, এই সময়ে ঘনশ্যাম ডাইনের পথ ধরিল। বলিল—আপনি সোজা চলে যান—আমি রজনীর বাড়ি ঘুরে এক্ষুনি যাচ্ছি।

কহিলাম—দাঁড়াও, ঘনশ্যাম—

বোধকরি কণ্ঠস্বরের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু প্রকাশ পাইয়া থাকিবে। সে চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

বলিলাম—আমি এক্ষুনি কাশী চলে যাচ্ছি, তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। পয়লা মোটরে মধুগঞ্জে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে।

ঘনশ্যাম সন্ত্রস্ত হইয়া হাতজোড় করিয়া কহিল—আজ্ঞে, কি অপরাধ করলাম?

আমি বলিলাম—অপরাধের কথা নয়। আমি এ সব পেরে উঠিনে, বাবাকে পাঠিয়ে দেব—তাতে কাজের সুবিধে হবে।

ইহাতে ঘনশ্যামের মতদ্বৈধ নাই, অতএব প্রতিবাদ করিল না, কেবলমাত্র কহিল—কিন্তু অন্ততঃ আজকের দিনটে থেকে যান, দারোগাবাবু আসবেন—আমরা আইন-টাইন তো তেমন বুঝিনে।

বলিলাম—ফল তাতে বড় সুবিধে হবে না ঘনশ্যাম, দারোগার সামনে হয়তো কি বলে বসব, কেস মাটি হয়ে যাবে। তাতে কাজ নেই।

বলিয়া হন-হন করিয়া পথটুকু পার হইলাম।

কাশী গিয়া বাবাকে যেই খবরটা জানাইয়াছি অমনি যেন বারুদে আগুন লাগিল। বলিলেন—যাক প্রাণ, রোক মান। তুমি কোন লজ্জায় পালিয়ে এলে, বাপু। রাইচরণের মুণ্ডটা আনতে পারলে না, যেত দু'পাঁচ হাজার—যেত। আমার কি? আমি আর ক'দিন? চোখ বুঁজলে সব ফক্কিকার—

বলিয়া গুম হইয়া বসিয়া খানিকক্ষণ বোধকরি সংসারের নশ্বরত্বাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। বলিলেন—এই গ্যাঁট হয়ে বসে রইলাম। নাগপুরেও যাচ্ছি নে—দেশেও না। বিষয়-আশয় কারবার-পত্তোর সব গোল্লায় যাক. কারো যখন গরজ নেই। আর যদি কোন দিন নড়ে বসি তাহ'লে—

একটা ভয়ানক রকমের শপথ করিতে গিয়া সামলাইয়া লইলেন। বুদ্ধির কাজ করিয়াছিলেন, কারণ শপথ সন্ধ্যা নাগাত তো ভাঙিতই হইত। বিকালবেলায় জিনিসপত্র গোছাইবার ধুম পড়িয়া গেল। আয়োজন গুরুতর। পাঁচজন পশ্চিমী গুণিলোক সঙ্গে যাইতেছে। আর যে কি-কি যাইতেছে, তাহার সঠিক খবর বলিতে পারি না, আন্দাজ করা চলে। বলিলেন—না মরলে আর অব্যাহতি আছে? ছাগল দিয়ে লাঙল চষা হ'লে লোকে আর ষাঁড় কিনত না—

ইঙ্গিতটা আমাকে উপলক্ষ করিয়া। কিন্তু অনর্থক। আমি তো কোন দিন ষণ্ডত্বের গৌরব করি নাই।

বাবা ততক্ষণে ট্রেণে চাপিয়া হয়তো মোগলসরাই পার হইয়া গেলেন। বীণা প্রশান্ত চোখ দু'টি আমার দিকে মেলিয়া শুইয়াছিল; আমি সেই রজনী পাইকের গল্প বলিতেছিলাম। হঠাৎ সে চোখ বুঁজিয়া জড়সড় হইয়া মাথাটি আমার কোলের মধ্যে গুঁজিয়া দিল। বলিল—তুমি থাম, আমার ভয় করে—

আমি কহিলাম—বীণা, তবুতো সে রক্ত তুমি চোখে দেখো নি।

বীণা কথা কহিল না। আলগোছে হাত দু'খানা বাহির করিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিল। চক্ষু তেমনি বোঁজাই আছে।

খানিক পরে চোখ মিট-মিট করিয়া চাহিয়া দেখিল, চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া আমি কি করিতেছি। আর মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তারপর আবার চোখ বুঁজিয়া দিব্য ভালমানুষের মতো ঘুমাইতে সুরু করিল।

বাবা ফিরিলেন, দিন পনের পরে। আবার গেলেন। এমনি যাতায়াতে বছর খানেক কাটিল। আগে যে মুখ গম্ভীর বিমর্ষ থাকিত, ক্রমশঃ তাহাতে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন—ঘনশ্যাম খুব জাঁহাবাজ—টাকাকড়ি একটু এদিক-ওদিক করে বটে, কিন্তু ক্ষমতা আছে। মহল একেবারে যাকে বলে পায়রা-চোখো—

আমার কেমন ধারণা হইয়াছিল, রাইচরণ বাঁচিয়া থাকিতে বিবাদ মিটিবে না। বাবার সেই পাঁচ হাজারের বিনিময়ে মুণ্ড আনিবার আক্রোশটাও মনে ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—রাইচরণ মরেছে না দেশ ছেড়েছে ?

বাবা কহিলেন—মরেও নি, দেশও ছাড়েনি। উচ্ছেদ করেছিলাম, তা বৌ-ছেলেপিলে নিয়ে কাছারী এসে পায়ে জড়িয়ে ধরল। ভাবলাম, চাষীদের মধ্যে সবচেয়ে মানীবংশ—যখন এতটা কাবু হয়েছে, যাকগে। পাই পয়সা না নিয়ে সেই মৌরশী পঁচিশ বিঘে কবলা করে দিয়ে গেল। আর ঘনশ্যামকে বলেছে ধন্ম-বাপ। এবার একবার গিয়ে দেখে এস তো—

মধুসূদনকে মনে মনে স্মরণ করিয়া সভয়ে প্রার্থনা করিলাম, যেন দেখিয়া আসিবার প্রয়োজন সেবারকার মতো আর কখনো না হয়।

কিন্তু মধুসূদন সে প্রার্থনা কানে শুনেন নাই।

ইহার কিছুদিন পরেই কেবলমাত্র চোখের দেখা দেখিয়া আসা নয়—দেশে চিরস্থায়ী বসবাস করিবার প্রয়োজন ঘটিল। বাবা স্বর্গীয় হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কারবারটিও। বীণা বাপের বাড়ি গিয়াছিল,

মাকে শ্যামবাজারে মাতুলালয়ে আনিয়া রাখিলাম। তারপর বাড়িঘর মেরামত করিয়া বাসযোগ্য করিবার জন্য ঘনশ্যামের সুশাসিত নিরুপদ্রব মহলে অনেকদিন পরে আবার আসিয়া পৌঁছিলাম।

না, ইতিমধ্যে দেশের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে বটে। গঞ্জের আট-খানা দোকানে টিনের চাল দিয়াছে। আধঘণ্টা অন্ততঃ বাস,—কোন অসুবিধা নাই। বাসের ছাতের উপর বাক্স বোঝাই হইয়া সহরে মাছ চালান যায়। নূতন পোষ্টাফিস হইয়াছে। মাঝে মাঝে দেশ-বিদেশের ভদ্রলোকেরা বন্দুক লইয়া বিলে পাখী শিকার করিতে আসেন। মাছ চালান দিতে অনেক বরফের দরকার হয় বলিয়া একটি আইস-ফ্যাক্টরী খুলিবার কথা হইতেছে। কোন কোম্পানী জায়গাও দেখিয়া গিয়াছে। গ্রামের প্রান্তে তিনটি তাড়িখানা। এবার নাকি একটি মদের দোকানের ডাক হইবে। মোটের উপর সর্ব্বরকমে সুবিধা—যা চাও তা-ই মিলিবে।

সর্ব্বাগ্রে উঠানের জঙ্গলগুলি কাটাইবার দরকার। সকালবেলা ঘনশ্যামকে লইয়া নিজেই বাহির হইলাম—প্রাতর্ভ্রমণ হইবে, মজুরের তল্লাসও হইবে। কিন্তু মজুর পাওয়া কিছু কঠিন—অঞ্চলে মোটে চাষা-ভুষা নাই, তার পাইবে কোথায়? খালি খালি ভিটা পড়িয়া রহিয়াছে। দু'চারজন যাহারা আছে অবস্থা ভাল হইয়া গিয়া তাহারা আর মজুরী করিতে চাহে না। অবস্থা ভাল হইয়াছে, ঘনশ্যামের মুখে শুনিলাম। নীচু নীচু জীর্ণ কুঁড়েগুলি দেখিয়া মনে হয়, বইয়ে যে বীবরের

বাসস্থান পাড়িয়াছি তাহা বোধকরি এই প্রকার। ইহার মধ্যে মানুষ যে সত্যসত্যই ঘর সংসার করিয়া বাঁচিয়া থাকে, চোখে না দেখিলে তাহা বিশ্বাস হয় না।

দুই জনের বাড়ি হইয়া তারপর গেলাম চরণ বেপারীর বাড়ি। চরণ দেখি কাঁচের গেলাসে করিয়া কি খাইতেছে। বলিল—নায়েব মশায়, বিশ্রী অভ্যেস হয়ে গেছে। সকালে উঠে আগে চাই মিছরীর পানা। নইলে মাথা ধরবে।

রোগ কঠিন বটে।

বলিলাম—ও চরণ, ভাল আছিস? আজকাল বেশ পয়সাকড়ি কামাচ্ছিস্—না?

চরণ চিরদিনই বিনয়ী লোক। মুখখানা কাচুমাচু করিয়া জোড়-হাতে বলিল—যে আজ্ঞে। লক্ষ্মীর কিরূপা মুখ ফুটে কি বলব,—আপনার মা-বাপের আশীর্ব্বাদে হচ্ছে এক রকম! বাবু, এলেন কবে?

ঘনশ্যাম বলিল—বাবুরা সব দেশে-ঘরে চলে আসছেন। বাড়ির বাগান সাফ হবে। আজকে জন খাটবি, চরণ?

চরণ বলিল—খাটব। তারপর ঘাড়টা ডানদিকে কাত করিয়া

আবার বলিল—খাটব। বাবুরা এসেছেন, খাটব না?—নিশ্চয় খাটব।

—তবে যাস সকাল-সকাল। বলিয়া বাহির হইলাম। পিছন হইতে ডাকিল—নায়েব মশায়!

দুইজনেই ফিরিয়া দাঁড়াইলাম।

চরণ হাসিয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে বলিল—একটা টাকা। জনের দাম আগাম না দিতে পারেন চোটা হিসেবে দিন। দিন দু'পয়সা সুদ—যা রেট আছে। আজকের সুদ কেটে নিয়ে সাড়ে পনেরো আনাই দিয়ে দিন বরং—

ঘনশ্যাম কহিল—সকালবেলা টাকা কি হবে?

আমরা বাড়ির মধ্যে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গে চরণের বৌ মাথায় কাপড় টানিয়া লজ্জায় জড়সড় হইয়া উঠানের এককোণে বসিয়া ঝাঁট দিতেছিল। আঙুল দিয়া তাহাকে দেখাইয়া চরণ কহিল—মাগীর বজ্জাতি। বলছে চাল বাড়ন্ত। সব চাল বেচে খেয়েছে, থাকবে কোত্থেকে?

এত বড় অভিযোগের পর লজ্জাবতী আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘোমটা আরো একটু বাড়াইয়া দিয়া এক প্রকার স্বগতভাবেই বলিয়া উঠিল—বেয়াক্কিলে কথা। সব চাল বেচে খেয়েছে—কত চাল এসেছিল শুনি?

চরণ কহিল—কাল পাঁচসিকের মাছ বিক্রি হল তার হিসেব দে। দে শিগ্‌গির।

বৌয়ের হিসাব-জ্ঞান খুব প্রখর বলিতে হইবে। অমনি মুখে মুখেই তৎক্ষণাৎ সুরু করিল—শোন্। চুরি করে খেয়েছি নাকি? এই সরু বালাম চাল দু'সের—ছ' আনা, ঘি সাড়ে সাত আনা, মিছরী গরম-মশলায় হল সাত পয়সা—আর রইল এক পয়সা, তুই বললি নে যে এক পয়সা রেখে কি হবে—কর্পূর কিনে নিয়ে আয়, জলে দিয়ে খাওয়া যাবে। সে কি আমার দোষ?

হিসাব পাইয়া চরণের আর কথা বলিবার উপায় রহিল না।

ঘনশ্যাম জিজ্ঞাসা করিল—কাল রাত্তিরে বুঝি কিছু হয় নি।

চরণ কহিল—না। কাল বড্ড পাহারায় ছিল। কোন দিন যে কি হবে কিছু ঠিক করে বলবার যো নেই—তবে মোটের ওপর ব্যবসাটা ভাল। বেশ আছি। কোন ঝক্কি নেই, বাবা। মাঠের উপর হাঁটু জলে হৈ হৈ করে গরু তাড়িয়ে লাঙ্গল চষে বেড়ানো—রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, ও-সব কি আর পোষায়?

পথে আসিয়া চরণ বেপারীর ব্যবসার কথাটা পাড়িলাম। কি এমন সুবিধাজনক ব্যবসা সে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে?

ঘনশ্যাম সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। একা চরণের এ ব্যবসা নয়, চাষীদের মধ্যে যাহারা এখনো এ-অঞ্চলে টিঁকিয়া রহিয়াছে সকলেই ইহা ধরিয়াছে। ব্যবসাটা ভাল। রাত্রিবেলা ঘণ্টা তিন-চারের কাজ মোটে। সারাদিন সকাল দুপুর সন্ধ্যা কখনও কোন পুরুষমানুষকে নড়িয়া বসিতে হয় না। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া দেখ—হয় ঘুমাইতেছে, নয় তাস

খেলিতেছে, নয় তো তাড়ি খাইতেছে। দশটা বেলা না হইতেই সাবান ও গন্ধতৈল লইয়া দলে দলে পুকুরঘাটে নাহিতে বসে। চুল বাগাইয়া টেরী কাটিতে সময় কিছু যায়। গভীর রাত্রিতে গ্রামের মধ্যে যখন নিশ্চল নিষুপ্তি সেই সময়ে জাল ঘাড়ে কুঁড়ে হইতে টিপি-টিপি এক এক জন বাহির হইয়া পড়ে। পরস্পর ফিস-ফিস করিয়া কথা, ঝুপ করিয়া এক এক বার জাল পড়ার শব্দ ···আবার ভোর হইবার আগে যে যার ঘরে ফিরিয়া আসে। জেলেদের পাহারার যে ব্যবস্থা আছে তাহা যথেষ্ট নয়, অতবড় সুবিস্তীর্ণ বিলের সবদিকে তাহারা নজর রাখিতে পারে না। আর ইহারাও সুযোগ সন্ধান সমস্ত শিখিয়া ফেলিয়াছে। তবে নিতান্ত বে-কায়দায় পড়িলে পিঠের উপর কোন দিন দুই এক ঘা যে না পড়ে তাহা নহে—কিন্তু তাহার বেশী আর কিছু না। দু-দশটা মাছ-চুরি জেলেরা তেমন গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না।

সকাল হইতে কাজ মেয়েদের। মাছ গঞ্জে লইয়া বেচিয়া বাজার করিয়া যাবতীয় ঘরকন্নার কাজ সারিয়া রাঁধিয়া পুরুষ-মানুষদের ডাকিয়া তুলিয়া খাওয়াইতে হয়। তা মন্দ নয়, এরা আছে বেশ।

ফিরিবার পথে রাইচরণের বাড়ি। সেই রাইচরণ দাস, যাহার মুণ্ডের প্রতি বাবার অত আগ্রহ ছিল।

ঘনশ্যাম বলিল—যাবেন ওর বাড়ি? আজ কাল মজুরী খাটে।

আমি বলিলাম—বেলা হয়ে গেছে, আজ থাক।

ঘনশ্যাম বলিল—না, না—দেখে যাই, চলুন। উঠানে গিয়া

ডাকিল—রাইচরণ ? - ও রাইচরণ ?

লম্বা-চওড়া বিশাল দেহ লইয়া সামনে দাওয়ার উপর পড়িয়া আছে, তবু উত্তর দিবে না। বেটা মরিয়া গেল নাকি ?

কিন্তু গরজ আমার, ডাক দিলাম—ও রাইচরণ, অসুখ করেছে ?

এবার অস্ফুট সাড়া আসিল—উঁ—

বলিলাম—বেলা দুপুর হয়ে গেছে, এখনো ঘুমুচ্ছ ?

চোখ দুইটা মেলিয়া আমার দিকে তাকাইল, যেন টকটকে রাঙা দু'টি গুলি, দেখিয়া ভয় করে। একেবারে মেয়েমানুষের মতো রাইচরণ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঘনশ্যাম বলিল—আকণ্ঠ তাড়ি গিলেছিস্ বুঝি ? আজকে জন খাটতে যাবি ?

যাব—বলিয়া স্বীকার করিয়া পুনশ্চ সে ঘুমাইতে সুরু করিল।

বেলা বাড়িতেছিল, ইহার কাণ্ড দেখিয়া আর রাগের সীমা রহিল না। ঘনশ্যামকে বলিলাম, চল—যাওয়া যাক—বেটা মাতাল—

কথাটা রাইচরণের কানে গিয়াছিল। ধীর গম্ভীরভাবে উঠিয়া বসিল। তারপর একখানা পা বাড়াইয়া দিয়া কোণের চাউলের কলসীটায় ঠন করিয়া লাথি মারিতেই ভিতরে নড়িয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ শুইয়া পড়িয়া কহিল—না, আমি যাব না।

ঘনশ্যাম কহিল—ঘরে চাল আছে, আর কি বেটা নড়বে ? চলুন—

রাইচরণও হাত নাড়াইয়া আমাদের চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া

বলিল—গতর খাটানো ছোট কাজ, ও-সব আমি করিনে—

দিন পনেরোর মধ্যে বাড়ির জঙ্গল একদম সাফ হইয়া গেল, আবার শ্রী ফিরিল। চার-পাঁচটা কুঠরীর চুণকাম করিয়া একেবারে নূতনের মতো হইয়াছে, আর-আর যাহা কাজ আছে ধীরে-সুস্থে পরে করিলেই চলিবে। জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হইয়া গেল, আষাঢ়ের প্রথমেই নূতন সংসার পাতিবার আর কেন বাধা নাই। এক দিন বৈকালে সাগরগোপের স্কুলঘরের কাছে বল্লভ রায়ের রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। আগে শ্যামবাজার হইয়া শ্বশুরবাড়ি যাইব। বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে হইল না, বাস আসিল। গাড়ীতে উঠিয়া দিব্য করিয়া গদির উপর আরাম করিয়া বসিলাম। আর একদিন ছেলেবয়সে ছোটকাকার বিয়েতে এই পথে কত দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতে হইয়াছিল। দেশের কি আর সে দিন আছে?

তীরের মত ছুটিয়া চলিয়াছি। দূরের গ্রাম হইতে এক পাল গোরু চরাইয়া রাখালেরা ফিরিয়া আসিতেছে। গাড়ী হর্ণ বাজাইতে বাজাইতে পালের মাঝখান দিয়া চলিল। এ পথে এমন হইয়াছে যে গোরুগুলা পর্য্যন্ত আজকাল মোটরগাড়ী ভ্রূক্ষেপ করে না।

মুক্ত বিলের বাতাসে রাস্তার দুই পাশে ছলছল শব্দে জলের আঘাত লাগিতেছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবলি সীমাহীন জলরাশি। জলের মধ্যে মধ্যে এখানে সেখানে তাল ও শিমুল গাছ। চারিদিক অন্ধকার করিয়া মেঘ জমিয়া আসিল। দু'একটি লোক ছাতা খুলিয়া পাশ

কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে, হেড-লাইট জ্বালিয়া গাড়ী ছুটিতেছে চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে মোটর-এঞ্জিনের একটানা আওয়াজ।

মাঝে মাঝে পথ গিয়াছে সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া। বাঁক ফিরিবার মুখে গাড়ীর তীব্র আলো এক একবার জলের উপর পড়ে। বল্লভ রায়ের উঁচু পাকা রাস্তা, মানুষের ঘরবাড়ি ডুবিয়া যায় কিন্তু রাস্তার উপর জল উঠে না। মোটর হর্ণ বাজাইয়া নির্ব্বিঘ্নে ছুটিতে লাগিল।

হঠাৎ একটি গাছের তলায় আসিয়া গাড়ী থামিয়া গেল। ড্রাইভার নামিয়া পড়িল, ম্যাগনেটে কি দোষ হইয়াছে, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঠিক হইয়া যাইবে। যাত্রীরাও সকলে নামিয়া পড়িলাম। গাছটিকে চিনিলাম —অশ্বত্থ গাছ। সাম্‌নেই নূতন পুল। দেখিতে দেখিতে পিছন হইতে তিনখানা বাস পর পর আমাদের পাশ কাটাইয়া আগে চলিয়া গেল। উজ্জ্বল আলোকে অশ্বত্থগাছের আগাগোড়া, টার্ণার ব্রিজ এবং রাস্তার বহুদূর অবধি উদ্ভাসিত হইল। এই অশ্বত্থগাছের তলা দিয়া লক্ষ টাকা দিলেও কেহ যাইতে চাহিত না। আজ আর সেদিন নাই। গাছের ডালপালা ছাঁটিয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে গাড়ী চালাইবার কোন অসুবিধা না হয়।

পাঁচ মিনিটের জায়গায় পনের মিনিট কাটিয়া গেল, কিন্তু আমাদের গাড়ীখানি যেমন স্থাণু হইয়া ছিল তেমনি রহিল। বেড়াইতে বেড়াইতে ব্রিজের উপর গিয়া দাঁড়াইলাম। নিম্নে সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্য দিয়া পুঁটিমারী বিলের সুবিপুল জলরাশি বাহির হইবার চেষ্টায়

পাক খাইয়া প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করিতেছে। লোহার কপাট ফেলা আছে। জলের এমন উন্মত্ত গর্জ্জন, যেন একসঙ্গে সহস্র মানুষ ঐ লোহার কবাটে মাথা ঠোকাঠুকি করিয়া মরিতেছে। চুপ করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল, এমনি একাগ্রে যদি নিশীথ রাত্রি অবধি কান পাতিয়া থাকিতে পারি, তবে নিশ্চয় জলের ভাষা বুঝিতে পারিব। বহুকাল পূর্ব্বে এক নিরীহ ঘুমন্ত শিশুর রক্ত দিয়া এখানে বাঁধ বাঁধা হইয়াছিল, জলস্রোত অবহেলায় সে বাঁধ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। এবার গভর্ণমেণ্ট বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার লাগাইয়া লোহালক্কড়ে অপূর্ব্ব সেতু বাঁধিয়াছেন—নিস্ফল আক্রোশে বিলের জল গর্জ্জন করিয়া মরিতেছে, সেতুর একটা লোহাও ঢিলা করিতে পারে না।

সেকালের নর-বাঁধের কথা মনে পড়িল, ছোটকাকার বিয়ের কথা মনে পড়িল, দ্বারিক দত্তের কথা মনে পড়িল। একদিন আসন্ন সন্ধ্যায় গামছা পরিয়া কোমর জল ভাঙিয়া এই বাঁধ পার হইতে হইতে বলিয়াছিলেন—সহস্র নরবলি না হইলে এই খাল নাকি বাঁধা হইবে না। মিথ্যুক বুড়া ; খাল বাঁধা হইয়া গিয়াছে, সহস্র বলি হইল কই ?

বরঞ্চ দেখি, দেশের দিন ফিরিয়াছে—চারিদিকে আনন্দ—হাসি ! জলের শব্দে যেন উচ্ছল হাসির শব্দ শুনিতে লাগিলাম। চরণ বেপারী হাসিয়া বলিতেছে—হেঁ—হেঁ—সকালে উঠে মিছরীর পানা আগে চাই। রাইচরণ পা দিয়া চালের কলসী নাড়াইয়া দেখিতেছে, ঠন-ঠন করিয়া বিলের জলের মধ্যে যেন সেই কলসীর আওয়াজ হইতে লাগিল !

তাড়ি খাইয়া পাঁচু মণ্ডল, রাখু, বিশে সকলে যেন হল্লা করিয়া কোমরে
হাত দিয়া ঐ জলের মধ্যে বাইনাচ করিতেছে আর বলিতেছে—
আছি…বেশ আছি…ঝক্কি নেই…খাসা আছি—

একজন সহযাত্রী আমার দিকে আসিলেন। কহিলেন—বড় ঘ
অন্ধকার—এই যা। নইলে, নরবাঁধ বেড়াবার বেশ ঃ

আমি বলিলাম—নরবাঁধ বলছেন কাকে? সে-সব
এ হল টার্ণার-ব্রিজ—

—একটা পয়সা—

কেরে? তাকাইয়া দেখি অন্ধকারের মধ্যে
আসিয়া আমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। আশ্চর্য্য ঃ
এইটুকু ছেলে তুই, এখানে কোত্থেকে এলি?

জবাব না দিয়া ছেলেটি হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া

তারপর মুখ ফিরাইয়া দেখি, একটা দু'টি, নয়
মতো অশ্বত্থতলা দিয়া ছায়াচ্ছন্ন অনেক
করা যায় না এত। বিলের কোন
হইয়া রাস্তা পার হইয়া একে একে
উঠিতে লাগিল। কঙ্কালসার দেহ—প্রাণ
পুতুলের মত আমাদের সামনে আসিয়া নিঃশব্দে হ
লাগিল। শিহরিয়া উঠিলাম। সহযাত্রী মহাশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়া-
ছিলেন। বলিলেন—দেখছেন কি, এই হয়েছে বেটাদের পেশা।

ঐ সব গ্রামের লোক,—গ্রাম-ট্রাম ত আর নেই, তাই রাস্তার ধারে বসতি। চুরি-চামারি করে বেড়াবে—আর একটা লোক পেলে যেন ছেঁকে ধরবে মশাই। হারামজাদাদের পুলিশেও ধরে না—

অকস্মাৎ সেই কৃষ্ণ ছায়াগুলি কথা কহিয়া উঠিল। অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর—কিন্তু সেই ছলছলায়িত বিলের প্রান্তে ঘনান্ধকার বর্ষারাত্রির উষ্ণ স্যাঁতসেঁতে শীতল বায়ু প্রবাহের মধ্যে আমার মনে হইল, ইন্দ্রিয়াতীত অশরীরী জগৎ হইতে রক্ত মাংসের মানুষের উদ্দেশে শত সহস্র প্রেতমূর্তি হাহাকার করিয়া উঠিতেছে। কি তাহারা বলিল, বহু জনের সমবেত কাকুতির মধ্যে তাহার এক বিন্দু বুঝিলাম না, শুধু মাথা হইতে পা অবধি বিদ্যুৎ-স্পর্শের মতো সুতীব্র কম্পন বহিয়া গেল। হঠাৎ মোটর হইতে তীব্র আলো জ্বলিল, কল ঠিক হইয়া গিয়াছে। ড্রাইভার চীৎকার করিয়া উঠিল—রাস্তা ছাড়, তফাৎ যা, তফাৎ—

মূর্তিগুলি ছুটাছুটি করিয়া রাস্তার নীচে যে অদৃশ্য প্রান্ত হইতে বাহির হইয়াছিল, মুহূর্ত মধ্যে সেখানে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

আমার দ্বারিক দত্তের কথা মনে পড়িল। দাড়ি নাড়াইয়া তিনি কি কহিতেছেন, বুড়া মারা গিয়াছেন বছর আষ্টেক আগে। ভাবিলাম, বুড়াকে বিদ্রূপ করিয়াছিলাম—প্রেতভূমি হইতে তাই কি ডজন পাঁচ ছয় আমদানী করিয়া বলির নমুনা দেখাইয়া গেলেন?

মাথুর

মাসখানেক মাত্র নিরুদ্দেশ থাকিয়া উমানাথ বাড়ি ফিরিয়াছে কাল রাত্রে। এত শীঘ্র ফিরিবার কারণ, মঠবাড়িতে মেলা লাগিয়াছে, ভাল ভাল কীর্ত্তনিয়ারা আসিয়াছে, বিশেষ করিয়া এবার সোনাকুড়ের বালক-সঙ্কীর্ত্তনের আসিবার কথা। খবরটা কাকপক্ষীর মুখে কি করিয়া তাহার কানে পৌঁছিয়াছিল।

বড় ভাই ক্ষেত্রনাথ দাওয়ায় বসিয়া সকালবেলার মিষ্ট রোদ সেবন করিতে করিতে একখানা দলিলের পাঠোদ্ধারের চেষ্টায় ছিলেন। দলিলটি বহু পুরাণো, পোকায় কাটা, জায়গায় জায়গায় ছিঁড়িয়া এমন পাকাইয়া গিয়াছে যে, এক একটা জট খুলিতেই একটি বেলা লাগে।... উমানাথ সোজা সেইখানে উঠিয়া তড়বড় করিয়া আপনার বক্তব্য বলিতে লাগিল।

বিস্মিত চোখে ক্ষেত্রনাথ একবার মুখ তুলিয়া দেখিলেন। কথা শেষ হইলে প্রশ্ন করিলেন—জগদ্ধাত্রীর বাড়ি কবে গিয়াছিলে?

—কুড়ি-বাইশ দিন আগে।

—হৃদয় ছিল সেখানে?

—না।

হুঁ—বলিয়া ক্ষেত্রনাথ চুপ করিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিলেন। তারপর হাতের দলিল সযত্নে ভাঁজ করিয়া রাখিয়া বলিলেন—আমি জগদ্ধাত্রীর চিঠি পেয়েছি পরশুদিন। এখন তোমার ঐ বিশ দিনের বাসি খবর শুনে লাভালাভ নেই—

দলিল বাক্সবন্দী করিয়া ধীরেসুস্থে পরম নিশ্চিন্তভাবে তিনি তামাক ধরাইয়া বসিলেন। এবার বলিবার পালা তাঁহার। কণ্ঠ চিরদিনই প্রবল, আজও তাহার অন্যথা হইল না। বাক্যের তূণ একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেলে ক্ষেত্রনাথ অন্য কাজে চলিয়া গেলেন, তাহার পরেও উমানাথ সেখানে একইভাবে বসিয়া রহিল।

ঘণ্টা দুই পরে বাড়ির মধ্যে গিয়া তরঙ্গিণীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। তরঙ্গিণী ভালমানুষের ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—বট্‌ঠাকুরের সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল ?

অর্থাৎ এবার দ্বিতীয় কিস্তি। উমানাথ চুপ হইয়া রহিল।

তরঙ্গিণী আবদারের ভঙ্গীতে মোলায়েম সুরে বলিতে লাগিল—তা বল, বল না গো—মেয়েমানুষ, ঘরের কোণে পড়ে থাকি, কামাই-ঝামাই করে এলে এদ্দিন পরে, ভালমন্দ কত নিয়ে এলে, দেখে এলে, শুনে এলে—বল না দুটো কথা, শুনি—

উমানাথ বলিল—জগদ্ধাত্রী দিদি ওঁরা দেশে ঘরে ফিরেছেন, তাই বলছিলাম দাদাকে—।

—গুরুকন্যে ? মস্তবড় খোসখবর, গামছা বখশিস্ দিই ? তরঙ্গিণী হাসিয়া যেন গলিয়া পড়িতে লাগিল। গামছা হাতে সে মাথা মুছিতেছিল, সেটাকে পরম পুলকে সে স্বামীর দিকে আগাইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—পুরুষের ত মুরোদ হ'ল না যে, জন্মের মধ্যে পরিবারের হাতে একটা কিছু দিই এনে···তা আমি দিচ্ছি এই গামছাখানা বখশিস্—

মান মনে আহত হইয়া উচ্চকণ্ঠে উমানাথ বলিল—গামছা বখশিস্ কেউ আমায় দেয় না—

তরঙ্গিণী তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া লইল—না, তা-ও দেয় না। হাসিয়া কহিতে লাগিল—গামছা ত দেয় না, উত্তম-মধ্যম দেয় কি-না, বোলো ত একদিন—

উমানাথ এ কথায় একেবারে ক্ষেপিয়া গেল।

—মহাশ্থাক তোমরা। বখশিসের কত শাল-দোশালা এনে দিয়েছি এ যাবৎ, তবু বার বার ঐ কথা। উত্তম-মধ্যম দেয়···দিলেই হ'ল অমনি? ডাকো দিকি দশ গ্রামের সভা, ডাকো একবার এদিককার যত কবিওয়ালা-। বলিতে বলিতে উত্তেজনার মুখে কবিতা বাহির হইয়া আসিল-

হরেক কবি হরবোলা
সবার উপর ময়রা ভোলা,
তাঁর শিষ্য সহায়রাম,
গুরুর পায়ে কোটি প্রণাম—

গুরু সহায়রামের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া অবশেষে সে কিঞ্চিৎ শান্ত হইল।

তরঙ্গিণী কিন্তু একবিন্দু রাগ করে নাই, তেমনি হাসিভরা মুখ।

খানিক পরে উমানাথের রাগ পড়িয়া আসিলে পুনরপি প্রশ্ন হইল—ঠাকরুণের ওখানে স্থিতি হয়েছিল ক'দিন, ওগো ?

উমানাথ সদম্ভে বলিতে লাগিল—ক'দিন আবার, যাবার পথেই প্রড়ল বলেই ত! দলের সমস্ত লোক হাটখোলার পাশে উনুন খুঁড়ে নিল, আমি ত আর তা পারি নে? হাজার হোক পজিশন আছে একটা—

বলিয়া পজিশন-মাফিক গম্ভীর হইল।

তবু তরঙ্গিণী সমীহ করিল না বলিল—তা জানি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করছি, পজিশনটা টিঁকলো কি করে? অতিথ ব'লে হাতজোড় করে গিয়ে তাঁর উঠোনে দাঁড়ালে ?

কথাবার্তার ধরণে মনে মনে শঙ্কিত হইলেও উমানাথ মুখের আস্ফালন ছাড়িল না।

—আমার বয়ে গেছে। হঠাৎ দেখা হল, তারপর আমারি হাত ধরে টানাটানি, সে কি নাছোড়বান্দা···কিছুতে শুনবেন না।

—তারপর ?

—তারপর সে এক বিরাট আয়োজন। জগদ্ধাত্রী দিদি আর বাকী রাখেন নি কিছু। দুধ-ঘি, সন্দেশ-রসগোল্লা, মাছমাংস বাটির পর বাটি আসছে পাতের ধারে; ফুরোয় না—

গম্ভীর কণ্ঠে তরঙ্গিণী কহিল—খাওয়া-দাওয়ার পরে ?

উমানাথ চমকিয়া গেল। ঝড় প্রত্যাসন্ন। সে পালাইবার পথ

খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু তাহার আবশ্যক হইল না। ছোটবৌ আসিয়া ঢুকিল; তার পিছনে মেজবৌ। দুটিই অল্পবয়সী। ক্ষেত্রনাথের মেজ ও ছোট ছেলের বৌ। বিয়ে এই বছর দুইতিন মাত্র হইয়াছে।'

জলচৌকির পাশে তেলের বাটি নামাইয়া রাখিয়া ছোটবৌ বলিল —নাইতে যান কাকাবাবু, রাত্তিরে ত উপোষ করে আছেন। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—তা, আমাদের ডাকতে পারলেন না—এমনি আপনি। এক দৌড়ে নেয়ে আসুন···নয় ত দেখবেন কি করি—

এই বলিয়া দুটি বৌ মুখোমুখি চাহিতেই ছোটবৌ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল!

দেয়াপাড়া-জাগুলগাছি অঞ্চলে যাঁহাদের গতায়াত আছে উমানাথ চাটুজ্জে অর্থাৎ ছোট চাটুজ্জের পরিচয় তাঁহাদিগকে দিবার দরকার নাই। বর্ষার সময়টা এই সর্ব্বসমেত মাস চারেক বাদ দিয়া বাকী দিনগুলি ছোট চাটুজ্জের দলের গাওনা লাগিয়াই আছে। দলটা কিন্তু হিসাবমত উমানাথের নয়, সে বাঁধনদার মাত্র। এবং রাহাখরচ ও টাকাটা-সিকিটা ছাড়া প্রাপ্তিও এমন কিছু নাই। তাই ঘর-বাহিরের ক্রমাগত হিতোপদেশ শুনিতে শুনিতে এক একসময়ে উমানাথ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, ছোটলোকের সমাজে ছড়া কাটিয়া বেড়াইয়া পিতৃপুরুষের মান

ইজ্জত যা ডুবিয়াছে তা ডুবিয়াছে—আর ডুবাইবে না। দিন কতক বেশ চুপচাপ কাটিয়া যায়, সে দিব্য বাড়ি বসিয়া খাইতেছে, বেড়াইতেছে, ঘুমাইতেছে,—হঠাৎ কেমন করিয়া খবর উড়িয়া আসে, অমুক গ্রামে ভারী হৈ-চৈ—তিন দলে কবির লড়াই, কার্ত্তিক দাস তার শিষ্য অভয় চরণ আর বেহারী ঢুলিকে লইয়া পূব অঞ্চলের সমস্ত বায়না ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতেছে। পরদিন সকাল হইতে আর ছোট চাটুজ্জের সন্ধান নাই, খেরোবাঁধা খাতাখানাও ঐ সঙ্গে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

বিকালের দিকে মঠবাড়ি হইতে খোলের আওয়াজ আসিতে উমানাথ শশব্যস্তে ঘরে ঢুকিয়া চাদর কাঁধে ফেলিল। বগলে যথারীতি গানের খাতা রহিয়াছে।

—দাঁড়াও ছোটদাদু, আমি যাচ্ছি—

ছ-সাত বছরের নিতাইচন্দ্র, কাল মারামারি করিতে গিয়া ফুলপাড় সৌখীন ধুতিখানার ক'জায়গায় ছিড়িয়া আসিয়াছে, তরঙ্গিণী তাহাই মেরামত করিতে লাগিয়াছে। উবু হইয়া বসিয়া বসিয়া নিতাই মনোযোগের সঙ্গে শিল্পকার্য্য দেখিতেছিল, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—আজকে আর থাক রাঙাদিদি, উ-ই দাও। ছোটদাদু মেলায় যাচ্ছে, আমি যাব—

তরঙ্গিণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—যাও তাই। ছোটদাদু সন্দেশ কিনে খাওয়াবে—

তারপর তরঙ্গিণী নাতিকে কাপড় পরাইয়া সুন্দর করিয়া কোঁচা দিয়া দিল। গায়ে পরাইয়া দিল, সবুজ একটি ছিটের জামা। ফুটফুটে মুখখানি অতি যত্নে আঁচলে মুছাইয়া মুগ্ধচোখে কহিল—বর পাত্তোরটি চলেছেন। বৌ নিয়ে আসা চাই কিন্তু নিতু বাবু।

উদ্দেশে কিল তুলিয়া নিতু বলিল—বুড়ী!

—বুড়ী বলেই ত বলছি মাণিক। কাজ করতে পারিনে, তোমার কাকীরা মনে মনে কত রাগ করে। এমন বৌ নিয়ে আসবে যে দু'বেলা আমাদের কাজকর্ম্ম রান্নাবান্না করে খাওয়াবে, কোলে করে সকাল-বিকাল তোমায় পাঠশালায় দিয়ে আসবে…কেমন?

নিতু লজ্জা পাইয়া একদৌড়ে পলাইয়া গেল।

তারপর হাসিতে হাসিতে উমানাথের দিকে ফিরিয়া বলিল—তুমিও একটা জামা গায়ে দাও, শীতের দিন—এতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না গো—

উমানাথের অত অবকাশ নাই। কাঁধের চাদরের উপরেই একটা কামিজ ফেলিয়া সে পা বাড়াইল।

পিছন হইতে তবু বাধা।—শোন—

তরঙ্গিণী কহিতে লাগিল—ভাস্থর ঠাকুর খেতে বসে বড্ড দুঃখ করছিলেন; আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে সব বলছিলেন—

ভূমিকার রকম দেখিয়া উমানাথের মুখ শুকাইল। এককথায় হাঁ—না করিয়া সরিয়া পড়িবার ব্যাপার ইহা নহে; ওদিকে খোল করতালের ধ্বনি ক্ষণপূর্ব্বে থামিয়া গিয়াছে; অর্থাৎ গৌরচন্দ্রিকা সারা হইয়া নিশ্চয় এইবার পালা আরম্ভ হইল।

তরঙ্গিনী বলিল—তুমি সাতেও থাক না, পাঁচেও থাক না, অমন দাদা—বাপের মতন বললেই হয়—তাঁর সঙ্গে এসবের কি দরকার ছিল বল ত?

উমানাথ সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয়। সহায়রামের ভিটে থেকে এক সরষে বিক্রিই হয় বছরে কত টাকার?, এত কাল জগদ্ধাত্রী দিদি বিদেশে পড়ে ছিলেন, নিতে-থুতে আসেন নি—এখন কিছু না দিলে চলবে কেন?

তরঙ্গিনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তীব্রকণ্ঠে কহিল—এই যুক্তিগুলো কার শেখানো? জমাজমি আমাদের কি আছে, না আছে কোন দিন তুমি চোখ মেলে দেখেছ, না খবর রাখ? জগদ্ধাত্রী-দিদির মায়ায় আজ বড্ড টনক নড়ল। আর তা-ও বলি, অনাথা বিধবা মানুষ—তোর আপনার পেটে ভাত জোটে না, নেমন্তন্ন ক'রে চর্ব্বচোষ্য খাইয়ে এই যে ভাইয়ে ভাইয়ে ঘর ভাঙবার মতলব—এ দুষ্টবুদ্ধি কি জন্যে তোর?

কিন্তু শেষ কথাগুলি উমানাথ বোধ করি শুনিলই না। সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কহিতে লাগিল—সত্যি বউ, দিদি বড্ড

অনাথা। সত্যিই তাঁর পেটে ভাত জোটে না। সমস্ত শুনেছ তা হলে? কোত্থেকে শুনলে?

তরঙ্গিণী আঙুল তুলিয়া দেখাইল।

—ঐ ভাঙ্গা দেরাজটা খুলে দেখ। দেশে এসেছেন শ্রাবণ মাসে, সেই অবধি হপ্তায় হপ্তায় চিঠি। হৃদয় ঠাকুর-পো পৈতৃক শত্রুতা সাধতে লেগেছে, ও-ই হয়েছে আজকাল মন্ত্রী, সে যা শিখিয়ে দেয় ঠাকরুণ তাই লেখেন—

উমানাথ আর্দ্র স্বরে বলিল—কিন্তু অবস্থা দিদির সত্যিই বড় খারাপ। সাক্ষী আমি নিজে। নিজের চোখে দেখে এসেছি। দেখে দেখে জল আসে চোখে।

—তারই মধ্যে ত এই নেমন্তন্ন-আমন্তন্ন—দুধ-ঘি-মিষ্টি-মেঠাই! বুঝতে পার? ওগো বুদ্ধিমন্ত মশাই, মানে বোঝ এর? তরঙ্গিণী সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চাহিল।

—কিছু না, কিছু না। উমানাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিতে লাগিল—সমস্ত বাজে কথা বউ, আমি ওঁর বাড়ি নিজেই গেছলাম। খেতে বসেছি হঠাৎ বৃষ্টি এল। তারপর বাইরের বৃষ্টি থামল ত ঘরের বৃষ্টি আর থামে না। ভাতের থালা নিয়ে কোথায় গিয়ে বসি—লজ্জায় দুঃখে দিদি মুখ তুলতে পারেন না। আর সেই মোটা মোটা বীরপালা চালের ভাত—সহায়রাম রায়ের মেয়ে, গুরু সহায়রামকে গড় না ক'রে তিনটে জেলার কেউ কবির আসরে নামতে সাহস করে না—তাঁর

মেয়ের এই রকম হাল! বলিতে বলিতে উমানাথের কণ্ঠ ভারী হইয়া আসিল; হঠাৎ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া জামাটা পরিয়া লইবার অত্যন্ত তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল।

গান চলিতেছে।

বকুল ও মাধবীলতার কুঞ্জবন, তাহারই পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মূল গায়েন মুখরা বৃন্দাদূতীর বিদ্রূপ-বাণী বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিল—

বৃন্দা কহিতেছে—সুখে আছ ত মথুরার রাজা? তোমার নব-সঙ্গিনীকে পাশে লইয় ত্রিভঙ্গঠামে একবার দাঁড়াও—দেখি, বাঁকা শ্যাম আর কুব্জা নায়িকায় মিলিয়াছে কেমন? মনে কি পড়ে বন্ধু, কোথায় কবে এক রাখাল ছেলে বাঁশী বাজাইত—আর কাঞ্চন-লতা কুলের বধূ কূল ভাসাইয়া কলসী ভাসাইয়া ছুটিয়া আসিয়া পায়ে লুটাইত? আজিকার এই সুখবাসরের মধ্যে গন্ধদীপের আলোয় হঠাৎ যদি একটি ম্লান মুখ-চন্দ্র তোমার মনের দরজায় সসঙ্কোচে পলকের জন্য তাকাইয়া যায়, তাহাকে দূর করিয়া দিও মহারাজ, দুঃস্বপ্নকে মনে ঠাঁই দিতে নাই···

শ্রোতাদের মুখে মুখে ম্লান হাসি। যুগান্ত-পারের একটি সর্ব্ব-ব্যাপী বিরহ-ব্যথা গানের সুরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া শীতক্লিষ্ট ক্ষীণ, জ্যোৎস্নার মধ্যে সকলের বুকের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়াইতে লাগিল। উমানাথ তদ্‌গত হইয়া শুনিতেছিল। নিতাই ফিস্ ফিস্ করিয়া ডাকিল—ছোট দাদু!

উমানাথ কহিল—চুপ!

মিনিট কতক চুপ করিয়া নিতাই ছেঁড়া কানাতের ফাঁকে আকাশের দিকে চাহিয়া আপন মনে কত কি বকিতে বকিতে আঙুল ঘুরাইতে লাগিল। আবার প্রশ্ন করিল—শোন ছোট দাদু, জয়ন্তী বলে কি, আগে নাকি আকাশ হাতে পাওয়া যেত—একদিন এক বুড়ী ঝাঁটার বাড়ি দিয়েছিল—সত্যি?

উমানাথ টানিয়া তাহাকে আরও কোলের কাছে আনিল।

—ঐ শোন্ খোকা, গান শোন্—

—না, বাড়ি চল—

মুখ না ফিরাইয়া উমানাথ বলিল—হুঁ—

আরও খানিক বসিয়া থাকিয়া নিতাই আস্তে আস্তে সামিয়ানার বাহিরে আসিল। তাকাইয়া দেখিল, ছোট দাদু কিছুই টের পায় নাই, তেমনি এক মনে গান শুনিতেছে।

গায়ক তখন গাহিতেছে—

"ওগো মাধব, গোকুলে চাঁদ ওঠে না, ভ্রমরের গুঞ্জন নাই, যমুনা কলধ্বনি ভুলিয়া গেছে আর তোমারি গরবিনি রাই আজ ধুলায় পড়িয়া আছে। দশমী দশায় কণ্ঠ তাহার নিরুদ্ধ, শ্বাস বহে কি না বহে; কবরী খুলিয়া পড়িয়াছে, চোখের জলে শতধারা নদী বহিতেছে; সখীরা তাহাকে ঘিরিয়া তোমার নাম কত শোনায়, ক্ষীণ কাঞ্চন-রেখা তনু ঈষৎ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে—কিন্তু চোখ মেলিবার ক্ষমতা নাই। অভাগিনী এতদিনে মরিয়া জুড়াইল বুঝি···

কৃষ্ণ অভয় দিলেন—ভয় করিও না। সখি বৃন্দে, তোমাদের কিশোর রাখাল আবার ফিরিয়া যাইবে···"

একজন দোয়ার আসরের পাশে সরিয়া তামাক খাইতেছিল, হাত নাড়িয়া উমানাথকে কাছে ডাকিল। কহিল—কেমন গান শুনছেন ছোট চাটুজ্জে মশাই ?

উমানাথ বলিল—খাসা।

উঁহু—বলিয়া লোকটা ঘাড় নাড়িল। বলিল—আরে মশাই, মাথুর পালা হ'ল এর নাম—চোখের জলে এতক্ষণ সতরঞ্চ ভিজে যাবার কথা। এ পালা কিচ্ছু বাঁধতে পারে নি। আর এ যা শুনলেন, শুনলেন; শেষটা একেবারে কিচ্ছু হয় নি। আপনাকে মশায়,

পালাটা আগাগোড়া একবার ঠিক ক'রে দিতে হবে। কর্ত্তাবাবু বলছিলেন আপনার কথা—

উমানাথ ঘাড় নাড়িল।

ইতিমধ্যে নিতাই ছুতারপটী, লোহাপটী, তরকারীর হাট পার হইয়া সার্কাসের তাঁবুর চারিদিকে বার আষ্টেক ঘুরিল। কিন্তু সুবিধা কোনদিকে নাই, তাঁবুর কোথাও একটু ছেঁড়া রাখে নাই। দরজার সামনে পরদা টাঙানো, তার ফাঁক দিয়া একটু-আধটু নজর চলে বটে কিন্তু সেখানে জনকয়েক এমন মারমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে ভিতরে চাহিতে সাহসে কুলায় না।

ওদিকে এক সারি দোকানে রঙ বাহার করিয়া গ্যাসের আলো জ্বালিয়া দিয়াছে, ঠিক যেন দিনমান। ছেলে-ছোকরার ভিড় সেইখানটায় কিছু বেশী। একটা দোকানের সামনে গিয়া নিতু অবাক হইয়া গেল, তাহার বয়সী আরও তিন-চারিটি ছেলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার, একটা ইঞ্জিন আর তার সঙ্গে খান তিনচার রেল-গাড়ী—পূজার সময় মামার বাড়িতে যে গাড়ী চড়িয়া গিয়াছিল, অবিকল তাই—তবে অতিশয় ছোট—আবার লাইনও পাতা রহিয়াছে। দোকানী দম দিয়া ছাড়িয়া দেয়, গাড়ী লাইনের উপর গড় গড় করিয়া একবার আগাইয়া যায়, আবার পিছাইয়া আসে···

মজা আরও আছে অনেক। এদিকে নাগরদোলা ঘুরিতেছে; পাশের একটা দোকান হইতে রকমারি বাঁশীর স্বর আসিতেছে, মাঠে বাজী পোড়ানো হইতেছে, শোঁ শোঁ করিয়া হাউই আকাশে উঠিয়া তারা কাটিতেছে···অন্য ছেলে কয়টি ছুটিয়া বাজী দেখিতে গেল। নিতাই আগাইয়া গিয়া ইঞ্জিনের গায়ে সন্তর্পণে একটু আঙুল বুলাইয়া দেখিল।

—নেবে খোকা ? পয়সা আছে কাছে ?

হুঁ—বলিয়া রাঙাদিদির কাছ হইতে আসিবার সময় কয়টা পয়সা আনিয়াছিল, তাহাই বাহির করিয়া দেখাইল।

দোকানী কহিল—ওতে হবে না ত, টাকা লাগবে। কার সঙ্গে এসেছ ? যাও বাবাকে নিয়ে এস, দশটা অবধি আমার দোকান খোলা আছে। যাও—

নিতুর অদৃষ্ট ভাল, ছোট দাদু অবধি যাইতে হইল না, সামনেই পড়িয়া গেলেন ক্ষেত্রনাথ। রোজ বিকালেই ক্ষেত্রনাথকে মেলায় আসিতে হয়। সঙ্কীর্ত্তনের আকর্ষণে নয়; মেলার মধ্যে চারিদিককার গ্রাম হইতে বিস্তর খেজুর গুড় আমদানি হয়। প্রতি বছর এই সময়টায় তিনি কিছু গুড় কিনিয়া রাখিয়া বর্ষাকালে দক্ষিণের ব্যাপারীরা আসিয়া পড়িলে ছাড়িয়া দেন। এইপ্রকারে দু-পয়সা লভ্য হইয়া থাকে।

নিতাই ক্ষেত্রনাথকে জড়াইয়া ধরিল। ক্ষেত্রনাথ কহিলেন—এসেছ আজ আবার ? কি বলবে বলে ফেল—দেরী কেন দাদা,

ক্ষিধে? বাড়ি থেকে পা বাড়ালেই ক্ষিধে অমনি সঙ্গে সঙ্গে পিছু নেয়—

নিতাই হাসিয়া আবদারের সুরে কহিল—কর্তাদাদু ই-দিকে একবার এস—শিগ্‌গির এসে দেখে যাও—

—গাঁট খালি—এই দেখ, আজ কিছু হবে না—

কিন্তু উল্টাগাঁট উঁচু হইয়া রহিয়াছে, নিতুর সেদিকে নজর আছে। বলিল—না কর্তাদাদু, আমার ক্ষিদে পায়নি—সত্যি পায়নি—বিদ্যের কিরে। তুমি একটিবার এসে শুধু দেখে যাও···

গাড়ী ও ইঞ্জিনের দাম দোকানী হাঁকিল পাঁচ সিকা।

অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া ক্ষেত্রনাথ বলিতে লাগিলেন—দিনে ডাকাতি করতে এসেছ এখানে? ঐ ত টিনের পাত, জিল-জিল করছে, তিনটে দিনও টিকবে না। আয় খোকা চলে যায়—কি হবে ও দিয়ে? আমরা নেব না—

দোকানী নিরুত্তরে স্প্রিঙে দম দিতেছিল। ছাড়িয়া দিতে ইঞ্জিন লাইনের উপর ছুটিতে সুরু করিল।

—চলে আয়—বলিয়া ক্ষেত্রনাথ নিতুর হাত ধরিয়া টানিলেন, কিন্তু সে নড়ে না। আর একবার টান দিতে দোকানের খুঁটি জাপটাইয়া চীৎকার শব্দে নিতাই কান্না জুড়িয়া দিল।

—সব তাতে তোমার ইয়ে—না? পাজী কাঁহাকা—

ক্ষেত্রনাথ যত টানেন তত জোরে সে খুঁটি আটিয়া ধরে। তারপর খুঁটি ছাড়াইয়া গেল ত ঝাঁপ ধরিতে যায়। নাগাল না পাইয়া সেইখানে মাটির উপর আছড়াইয়া পড়িল।

হঠাৎ শঙ্কিত ব্যস্ত স্ত্রীকণ্ঠ।

—ছুঁসনি, ছুঁসনি—অ হতচ্ছাড়া ছেলে, দিলি বুঝি এই রাত্তিরে ছুঁয়ে ?

মেয়েলোকটি ঠিক সে মেলায় আসে নাই, রাস্তার ধারে ছইওয়ালা একখানা গরুর গাড়ীতে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। গণ্ডগোল ও ছোটছেলের কান্না শুনিয়া কয়েক পা আগাইয়া উঁকি দিয়া ব্যাপারটা দেখিতেছিল। একদিকে স্তূপাকার বাঁশের চাঁচাড়ি পড়িয়াছিল, সেইখানে বসিয়া মেলার যাবতীয় বাঁশের কাজকর্ম হইয়াছে—স্পর্শদোষ বাঁচাইতে তাড়াতাড়ি সে ছুটিয়া তাহার উপর উঠিল। লোক জমিয়া যাইতেছে দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ নিতুকে ছাড়িয়া এক পাশে দাঁড়াইলেন।

জনমত ক্ষেত্রনাথের প্রতিকূলে। যার যেমন খুসী মন্তব্য করিতে লাগিল।

—আচ্ছা গোঁয়ার-গোবিন্দ হে! মেরেই ফেলেছিল ছেলেটাকে।—শাসন করতে হয় বলে এমনি শাসন?···রক্ত পড়ছে যে—লোকটা কে হে?—ধরে জেলে দেওয়া উচিত—

নিতুর হাতে-পাঁয়ে আচড় লাগিয়া দু-এক ফোঁটা রক্ত পড়িতেছিল, তাহা ঠিক।

ক্ষেত্রনাথকে যাহারা চিনিত তাহারা অত দরদ দিয়া সম্বর্দ্ধন করিতে পারিল না। বলিল—যা হবার হয়েছে চাটুজ্জে মশায়, রাগ না চণ্ডাল—আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না, তুলে নিন নাতিকে, বাড়ি গিয়ে কাটা জায়গায় তেল-টেল দিন গে।···হাঁটিয়ে নেবেন না যেন—গাড়ী ক'রে চলে যান।

স্ত্রীলোকটি ইতিমধ্যে নির্ব্বিঘ্ন স্তূপ হইতে নামিয়া নিতুকে কোলে তুলিয়া শান্ত করিতে বসিয়া গিয়াছে। প্রৌঢ়া বিধবা; দেহ ক্ষীণ বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বরের জোর যেমন অসামান্য যেমনি উহা যেন মধু ছড়াইতে ছড়াইতে বহিয়া যায়। ক্ষেত্রনাথের দিকে এক পলক তীব্র দৃষ্টি হানিয়া বিধবা কহিল—পয়সাকড়ি চিতেয় সঙ্গে নিয়ে উঠবে নাকি ?

অতিশয় সঙ্গীন প্রশ্ন। উচিতমত উত্তর দিতে গেলে মেলাক্ষেত্রে আবার একদফা দুর্য্যোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। বিশ গ্রামের লোকের সম্মুখে ক্ষেত্রনাথের আর তাহাতে উৎসাহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যাহাকে লইয়া এত লোকের এমন দুশ্চিন্তা, চক্ষের পলকে সেই নিতাইচন্দ্র লাফ লারিয়া উঠিয়া পুনশ্চ দোকানের খুঁটি আঁটিয়া ধরিয়া দাঁড়াইল।

বিধবা বলিল—দাও না গো দোকানী, ছেলেমানুষ ধরে বসেছে —দিয়ে দাও সস্তা করে।

দোকানী বলিতে লাগিল—একটাকার কম দেওয়া যায় না মা,

কল বলেই না এত দাম। এই গাড়ীটে নিন, চার পয়সায় দিচ্ছি। টোকা আছে, চোঙ আছে, কিন্তু টানতে হবে দড়ি বেঁধে—

—আমরা দড়ি বেঁধেই টানব, কি বল খোকা? বলিয়া চার পয়সার গাড়ীটা তুলিয়া সে নিতুর হাতে দিল।

ক্ষেত্রনাথ চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু রঙ্গস্থলে হৃদয় রায় আসিয়া পড়িতেই পরিচয় প্রকাশ পাইল। হৃদয়ের হাতে একবোঝা হাটের বেসাতি। বলিল—আমার কেনাকাটা হয়ে গেছে এইবার গাড়ীতে চলুন দিদি—

অর্থাৎ চল্লিশ বছর পরে জগদ্ধাত্রী বাপের বাড়ীর গ্রামে ফিরিতেছে, হৃদয় মুরুব্বি হইয়া লইয়া যাইতেছে। দূর জ্ঞাতিসম্পর্কের এই দিদিটির প্রতি ভক্তি তাহার যেরূপ, গুরুজনদিগের প্রতি সেই প্রকার ভক্তি এই কলিযুগের দিনে লোকে যেন শিক্ষা করিয়া রাখে।

জগদ্ধাত্রী ডাকিল—গাড়ীতে এস খোকা—

এবং নিতুকে কোলে তুলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

নিঃশব্দ গ্রামপথ। ক্বচিৎ কখনও মেলার ফিরতি দু-একটি লোকের সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। বালুপথে গরুর গাড়ীর শব্দ হইতেছে না। গাড়ীর পিছনে পিছনে ক্ষেত্রনাথ ও হৃদয়

পাশাপাশি চলিয়াছেন। খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ ক্ষেত্রনাথ কথা কহিয়া উঠিলেন—তাই ত বলি, ব্যাপার কি ? ভটচায-বাড়ি এত বড় খাওয়া-দাওয়া, তার মধ্যে আমাদের হৃদয় নেই। তোমার সেজ-ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলাম, বললে—বাবার পেটের অসুখ, নেমন্তন্নে আসবে না। নিজে না গিয়ে গাড়ী পাঠালেই ত জগদ্ধাত্রী আসতে পারত।—

হৃদয় অপ্রস্তুতের ভাবে নানা প্রকার কৈফিয়ৎ দিতে লাগিল—সে জন্য নয়···এমনি গিয়েছিলাম ওদিকে ; দিদি বললেন, এত বড় মেলা হচ্ছে, দেশবিদেশ থেকে মানুষজন আসছে, দেখে আসিগে একবার।···গাড়ী ভাড়া-টাড়া ওঁরই সব—আমার কি গরজ পড়েছে বলুন—

ওদিকে ছইয়ের মধ্যেও মৃদুকণ্ঠে কথাবার্ত্তা সুরু হইয়াছে।

নিতুর মতে এ জগতের একটি লোকও ভাল নয়।

—কর্ত্তাদাদু ?

—মারে।

—মেজ কাকী, ছোট কাকী ?

—তারাও।

বাবা এবং কাকাবাবুরা বাড়ি আসিবার সময় তার জন্য নানারকম জিনিস লইয়া আসে, সে হিসাবে ভালই ; কিন্তু অপরাধ তাদের, আবার চাকরী করিতে চলিয়া যায় ; বাড়ি থাকিতে বলিলে, কথা

শোনে না—মিছা কথা বলিয়া ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া চলিয়া যায়।

—আর আমি? জগদ্ধাত্রী সমস্যাময় প্রশ্ন করিয়া বসিল—আমি কেমন লোক, বল ত নিতুবাবু—

নিতাই চুপ করিয়া রহিল।

জগদ্ধাত্রী বলিল—এই গাড়ী কিনে দিলাম তোমায়, আমি ভাল না?

নিতাই কহিল—তোমার গাড়ী মোটে চলে না, কলের গাড়ী ভাল।

—আচ্ছা কিনে দেব ঐ কলের গাড়ী—হাসিমুখে জগদ্ধাত্রী বলিল—কিনে দেব, যদি এক কাজ করতে পার—

উৎসাহের প্রাবল্যে নিতাই খাড়া হইয়া বসিল।

—দাও—

—বললাম ত, একটা কাজ করতে হবে—

—কি বল, এক্ষুনি করব। নিতাই গরুর গাড়ী হইতে লাফাইয়া তখনই কাজে প্রবৃত্ত হইতে যায় আর কি।

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—আমায় যদি বিয়ে কর নিতুবাবু···করবে?

সঙ্কীর্ণ গ্রামপথ, পথের ধারে ছোট ছোট ঝোপজঙ্গল···আকাশে শীতের নির্জীব অস্পষ্ট চাঁদ, নিকটে-দূরে এখানে ওখানে ক'খানা ঘুমন্ত খোড়ো ঘর···হঠাৎ তাহার মধ্যে কোথা দিয়া কি হইয়া গেল—যেন এক

বৈঠার আঘাতে একটি ডিঙা চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর উজান ঠেলিয়া গেল—. গাড়ীর পিছনে চলিতে চলিতে ক্ষেত্রনাথ সেই কথা কয়টি শুনিতে লাগিলেন—আমায় বিয়ে করবে, আমায় বিয়ে করবে গো ?

বছর চল্লিশ পরে লোকনাথ ঠাকুরের মেলায় জনারণ্যের মাঝখানে ক্ষেত্রনাথ কয়েক মুহূর্তের জন্য আজ জগদ্ধাত্রীকে দেখিয়াছেন, দেখিয়াছেন বটে—তাহাও বড় ঝাপসা রকম, বয়সকালের চোখের সে দৃষ্টি নাই—রাত্রিবেলা কোন কিছু ভাল করিয়া দেখিতে পান না, সেই ক্ষণিকের দেখা মূর্ত্তি ভুলিয়া গিয়াছেন···কোন কালের কোন মূর্ত্তিই মনে নাই ; কেবল মনে আসিতেছে, কারণে-অকারণে খিল খিল করিয়া হাসি··· আবার সঙ্গে সঙ্গেই জলভরা অভিমানাহত ডাগর ডাগর চোখ দুটি···

—আমায় বিয়ে করবে ? ও দাদা, বিয়ে করবে আমায় ?

ক্ষেত্রনাথের বৌদি সম্পর্কের এক নিঃসন্তান বিধবা তাহাদের বাড়ীতে থাকিতেন। এতটুকু মেয়ে জগদ্ধাত্রী বেড়াইতে আসিলে বৌদিদি আদর করিয়া চুল বাঁধিয়া খয়ের-টিপ পরাইয়া গিন্নীর ঝাঁপি হইতে আলতা-পাতায় পা ছোপাইয়া অনেক শিখাইয়া পড়াইয়া তাহাকে ক্ষেত্রনাথের কাছে পাঠাইতেন। ক্ষেত্রনাথের বয়স বেশী, বুদ্ধিও বেশী। নায়িকার শুভ প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে স্বামিত্বের প্রথম সোপান-স্বরূপ তার পিঠের উপর যে বস্তু উপহার দিত তাহাতে জগদ্ধাত্রী ব্যথায় যত না হউক অভিমানে চতুর্গুণ কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিত।···সেই সব কথা মনে পড়িতে লাগিল।

সেদিন উমানাথ বাড়ি ফিরিল যখন চাঁদ ডুবিয়াছে। অত রাত্রেও ক্ষেত্রনাথের ঘরে আলো। উমানাথ খিড়কী ঘুরিয়া বাড়ির মধ্যে মধ্যে ঢুকিবার মতলবে টিপিটিপি কয়েক পা পিছাইয়াছে, কিন্তু ক্ষেত্রনাথের চোখকে হয়ত ফাঁকি দেওয়া যায়, কান ভারী সজাগ! বলিলেন—কে! কেও? এই ঘরে এস; তোমার জন্য বসে আছি কেবল—

হয়ত সত্যই তাহার অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন, কিন্তু নিতান্ত যে হাত পা কোলে করিয়া বসিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনটা দলিলের বাক্সই খুলিয়া ডালা তুলিয়া রাখা, প্রদীপে এক সঙ্গে অনেকগুলা সলিতা ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, চোখে চশমা-আঁটা, স্তূপীকৃত দলিলের মধ্য হইতে একখানা বাছিয়া ক্ষেত্রনাথ মেজের উপর উবু হইয়া যেন ঐ দলিলখানির উপর স্তিমিত চোখের সকল দৃষ্টিশক্তি ঢালিয়া দিয়া পড়িতেছিলেন।

উমানাথ কহিল—এখনো শোন্ নি আপনি?

এটা কিছু নূতন ব্যাপার নয়, আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই ইহাতে। বৈষয়িক ব্যাপারে ক্ষেত্রনাথের সতর্কতা চিরদিনই অপরিসীম, এ বিষয়ে দিনরাত্রি জ্ঞান নাই। দলিলের বাক্সগুলি থাকে শোবার ঘরে ঠিক শিয়রের কাছ-বরাবর, প্রত্যেকটি দলিলের গায়ে একটুকরা করিয়া কাগজ আঁটা, তাহাতে ক্ষেত্রনাথের স্বহস্তে লেখা স্থূলমর্ম্ম। শীতকালে এক-একদিন কাগজপত্র ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া রৌদ্রে দেন, সমস্ত

বেলা নিজে পাহারা দিয়া পাশে বসিয়া থাকেন, আবার নিজের হাতে সমস্ত গোছাইয়া নূতন কাপড়ের দপ্তরে সাজাইয়া বাঁধিয়া রাখেন। এমন অনেক দিন হইয়া থাকে,নিষুপ্ত গভীর রাত্রি—এক ঘুমের পর ক্ষেত্রনাথের মনে কি রকম একটা গোলমাল লাগিল, উঠিয়া আলো জ্বালিয়া বাক্স খুলিলেন, তারপর দু-চারিটা দলিল বাহির করিয়া নিবিষ্ট মনে খানিক পড়িয়া দেখিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইয়া শুইতে পারেন। গৃহিণী গত হইবার পর হইতে ইদানীং রোগটা আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

উমানাথ কহিল—রাত একটা-দুটো বেজে গেছে। আর রাত জাগবেন না দাদা।

ক্ষেত্রনাথ বাহিরের পানে চাহিলেন; কিন্তু জানলা বন্ধ, কি দেখিবেন? বলিলেন—রোসো। তাড়াতাড়ি কাগজপত্র তুলিয়া রাখিলেন, বলিলেন—এস এদিকে, সিন্দুকটা ধর দিকি—

—কোন্ সিন্দুক?

বিরক্ত মুখে ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—সিন্দুক ক'টা আছে তোমাদের বাড়ি? বাক্সের কথা বলছিনে, ঐ—ঐ সিন্দুক—

অনেক পুরাণো সেগুনকাঠের অতিকায় সিন্দুক, কাঠগুলি কাল পাথরের মত হইয়া গিয়াছে। এমন জিনিষ আজকালকার দিনে হয় না। আগে উহার সমস্ত গায়ে ফুল-তোলা অপ্সরী-আঁকানো বিস্তর সাজপত্র ছিল, দু-একটা করিয়া খুলিয়া পড়িতে পড়িতে এখন তার

চিহ্নমাত্র নাই। ইদানীং ইহা বড় একটা ব্যবহারেও আসে না। এখানে সেখানে তক্তার জোড় ফাঁক হইয়া ঘরের এক কোণে অবহেলিত ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে।

খানিক টানাটানি করিয়া উমানাথ কহিলেন—চার-পাঁচ মণের ধাক্কা দাদা, নড়ে চড়ে না একটু—

—ভাল করে ধর—বলিয়া ক্ষেত্রনাথ সিন্দুক ধরিয়া প্রাণপণ বলে ঝুলিয়া পড়িলেন। কিছুতে কিছু হয় না। পরিশ্রমের ফলে হাঁপাইতে লাগিলেন, বলিলেন—দেবীদাস রায়ের সিন্দুক এর নাম—নড়বে কি সহজে? মধ্যে আবার তোমার ঐ সহায়রাম আর সার্ব্বভৌম ঠাকুরের গুষ্টির পিণ্ডি বোঝাই করা। এই রাত্রে খুলে যে সব বের করে ফেলা, সেও ত মহা হাঙ্গামের ব্যাপার—

চিন্তান্বিত মুখে ক্ষেত্রনাথ চুপ করিলেন। উমানাথ বলিল—এখন কি ওসব হয়? দরকার হ'লে সকালবেলায় না হয় মানুষ-জন ডেকে সরিয়ে ফেলা যাবে—

—বুদ্ধির জাহাজ! ক্ষেত্রনাথ চটিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন—খুব কথা বল্‌লে তুমি, সকালবেলা লোক জানাজানি হ'য়ে যাবে না? যা করবার এখুনি করতে হবে। —সহসা যেন সমাধান দেখিতে পাইয়া বলিলেন—এক কাজ কর দিকি, চালির থেকে বালিশ-বিছানা সব পাড়ো। ঐগুলো সিন্দুকের উপর সাজিয়ে রেখে দাও, বাইরে থেকে

সিন্দুক যা'তে দেখা না যায়। মনে হবে, এখানে কেবল বিছানাপত্তোর গাদা করা রয়েছে।

সিন্দুক ঢাকা হইয়া গেল। ক্ষেত্রনাথ আলো ধরিয়া এদিক ওদিক ভাল করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া খুশী হইলেন। বলিলেন—জগদ্ধাত্রী ত জগদ্ধাত্রী, শ্মশান থেকে সহায়রাম রায় উঠে এলেও আর ধরতে হচ্ছে না।

সিন্দুকের ইতিহাস উমানাথ সমস্ত জানে এবং আজ জগদ্ধাত্রী যে গ্রামে আসিয়াছে সে কথাও কানে গিয়াছে। অতএব এখনকার আয়োজন দেখিয়া ব্যাপার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, বলিল—এই ত ভাঙাচোরা খানকতক তক্তা—কি-ই বা জিনিষ—এ দেখে তারপরে কি আর জগদ্ধাত্রী দিদি দাবী করতে আসবেন? আর করেনই যদি অনাথা বিধবার জিনিষ—দিয়ে দেওয়া উচিত—

রুক্ষ দৃষ্টিতে চাহিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—কোন্‌টা কার জিনিষ সে আমাদের সেকেলে স্বত্বাস্বত্বির কথা। তুমি তার কি খবর রাখ যে বলতে এসেছ?

তাড়া খাইয়া উমানাথ নিরুত্তর হইল। ক্ষেত্রনাথ তামাক সাজিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, উমানাথ ধীরে ধীরে

চলিয়া যাইবার উদ্যোগে আছে। কিঞ্চিৎ হাসিয়া সদয় কণ্ঠে কহিলেন —ভায়া আমার মনে মনে ভাবেন, দাদা দেশের লোককে ফাঁকি দিয়ে বিষয়-আশয় করেছে ··। জগদ্ধাত্রী আমায় এক চিঠি দিয়েছিল— দেখেছ।

—হ্যাঁ—

আশ্চর্য্য হইয়া ক্ষেত্রনাথ কহিলেন—কোন চিঠি দেখেছ ? কি লেখা আছে বল ত ?

—দেশে ফিরে অবধি দিদি ত ঢের চিঠি লিখেছেন। সেই যে সহায়রাম কাকার ভিটেবাড়ির দরুণ টাকা চেয়ে লিখেছিলেন—

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—ও ত হৃদয় রায়ের চিঠি—হৃদয় শিখিয়ে দিয়েছে, জগদ্ধাত্রীর হাতের লেখা কেবল। আগের চিঠি দেখেছ ?

—তাতেও ঐ। লিখেছেন—বসতবাড়ির দরুণ না দাও—ঘর সারাতে হবে,তারই সাহায্য বলে দাও গোটা পাঁচেক টাকা—

ক্ষেত্রনাথ অসহিষ্ণু ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—সে আগের কথা বলছি নে। তুমি সে সময়ে বিষ্ণুপুরে বেহালা বাজিয়ে বেড়াও। সহায়রাম রায় মারা গেলেন। জগদ্ধাত্রী সেই সময়ে দিল্লী থেকে চিঠি লিখেছিল। চিঠি নয়—সে আমার দলিল। দেখেছ ?

উমানাথ তাহা জানে না। ক্ষেত্রনাথ বলিতে লাগিলেন—গোড়া না জেনে বলতে নেই। বিয়ের পর-বছর জগদ্ধাত্রীকে নিয়ে গেল পশ্চিমে। সহায়রাম খুড়ো মারা গেলে খবর দিলাম, কেউ এল না।

জগো লিখলে, বাবার জিনিষপত্তোর যা আছে—তুমি নিও ; তুমি নিলেই বাবার তৃপ্তি হবে। ঐ হৃদয়ের বাপ বরদাকান্ত রায় মশায় তখন বেঁচে। তিনি এসে বাদী হলেন, বলেন—আমরা হলাম নিকট জ্ঞাতি ; সহায়রামের অস্থাবর আমাদের ডিঙিয়ে ক্ষেত্তোর চাটুজ্জে পর্যন্ত পৌছয় কি ক'রে ? লোক ডাকাডাকি, হুলস্থুল কাণ্ড। জিনিষের মধ্যে ত খান কতক পিঁড়ি-বারকোষ আর ঐ দেবীদাস রায়ের সিন্দুক—ছাইভস্মে বোঝাই। আমারও জেদ—তাই বা ছাড়ব কেন ?

ছাইভস্ম ? এই অঞ্চলের একটা বিখ্যাত বস্তু এই সিন্দুক, যা লইয়া সহায়রাম রায় পালা বাঁধিয়াছিলেন। এখনও ক্ষেত নিড়াইবার মরসুমে চাষাভূষার মুখে উহার দশ বিশটা কলি মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়। ক্ষেত্রনাথ সিন্দুক খুলিয়া দেখেন নাই, খুলিলে হয় ত দেখিতেন ছাইভস্ম নয়, তাল তাল সোনা ফলিয়া আছে। সহায়রামের গানের দু'টি ছত্র উমানাথের মনে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল—

সিন্দুকের মধ্যে সোনার বৃক্ষ, বৃক্ষে ফলে সোনা,—
আকাশের চাঁদ দিব পেড়ে (ও বাপ) সিন্দুক খুলিব না।...

নিজের ঘরে আসিয়া উমানাথ দেখিল, তরঙ্গিণী দুয়ার ভেজাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। একটা জানালা খুলিয়া দিতেই টাটকা বুনো

ফুলের গন্ধ আর সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুকের পালার কথাগুলি একটির পর একটি যেন বাহিরের ঘন অন্ধকারের মধ্য হইতে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। কত রাত্রি অবধি সে আপনার মনে গুণ-গুণ করিতে করিতে অবশেষে এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল ; ঢাকা দেওয়া খাবার পড়িয়া রহিল, খাওয়া হইল না।

দেবীদাস রায় সম্পর্কে জগদ্ধাত্রীর ঠাকুরদাদা—সহায়রাম রায়ের কি রকমের খুড়া হইত। বাপ ছিলেন দশকর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ, দু-দশ ঘর যজমানের কল্যাণে কায়ক্লেশে সংসার চলিত। কিন্তু দেবীদাস ওপথেই গেল না, দিনরাত কেবল কুস্তি লড়িয়া লাঠি ভাঁজিয়া ছোটলোকের ছেলেদের সঙ্গে বেড়াইত। মজা টের পাইল বাপের জীবনান্তে। বয়স তাহার তখন কুড়ি-বাইশ। নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি খুলিয়া অবাধ্য স্মরণশক্তিকে বশে আনিবার রীতিমত প্রয়োজন পড়িয়া গেল। ঠিক এই সময়ে এক যজমান-বাড়ি কি একটা ব্যাপারে যৎপরোনাস্তি অপদস্থ হইয়া আসিয়া মনের ঘৃণায় দেবীদাস নিরুদ্দেশ হইয়া যায় ; লোকে বলিত—নবদ্বীপের কোন টোলে পড়িতে গিয়াছে। পড়াশুনা কতদূর কি হইয়াছিল জানা নাই ; মাস ছয়েকের মধ্যেই একদিন সকাল বেলা

দেখা গেল, দেবীদাস ফিরিয়া আসিতেছে—সঙ্গে দু'খানা গরুর গাড়ী। একটা হইতে নামিল, বেশ গোলগাল-গড়ন হাসিমুখ একটি বধূ, অন্যটি হইতে নামান হইল ঐ বিশালকায় সিন্দুক।

মেয়েরা আড়ি পাতিতে গিয়া দেখিয়াছে, নববধূ গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত প্রদীপের সামনে তালপাতার পুঁথি লইয়া নিবিষ্ট মনে বসিয়া থাকিত আর দেবীদাস ঘাটের অপর প্রান্তে অনেকটা দূরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ঘুমাইত কি, কি করিত কে জানে? মোটের উপর বোঝা যাইত, সরস্বতী-সম্পর্কিত ব্যাপারগুলাকে তখনও দেবীদাস সসম্ভ্রমে পাশ কাটাইয়া চলে।

তারপর কেমন করিয়া বলিতে পারি না, বধূর সঙ্গে ভাব জমিয়া আসিল। এক একদিন রাত্রে টিপিটিপি ঘরে ঢুকিয়া দেবীদাস অধ্যয়নরতা বধূর যৌবনস্নিগ্ধ তদ্‌গত মুখের দিকে প্রলুব্ধ চোখে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিত। তবু সম্বিত হয় না দেখিয়া একটানে বালিশ বিছানা বধূ ও পুঁথিসুদ্ধ খাটখানি জানলার দিকে হুড়মুড় করিয়া টানিয়া লইত, বধূ চমকিয়া সলজ্জভাবে তাড়াতাড়ি বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইত, মুখে ঈষৎ বিরক্তির ছায়া। তখনই সে ভাব সামলাইয়া একটু হাসিয়া বলিত—অমনি করতে হয়? এসে সাড়া দাও নি কেন?

দেবীদাস হাসিমুখে চাহিয়া থাকে।

বধূ বলিত—খাট সমেত টেনে নিলে,তোমার গায়ে জোর ত খুব—

দেবীদাস সগর্ব্বে পেশীবহুল সুপুষ্ট হাত দু'খানা নাড়িয়া বলিত—ভারী ত! এতে আর জোরটা কি লাগে? আচ্ছা ঐ সিন্দুকটাও চাপিয়ে দেও খাটের উপর। তারপর যেমন বসেছিলে তেমনি থাকো। দেখো—

আবার হাসিয়া বলিত—এ বসে বসে কেবল তালপাতা নাড়া নয়।

বিস্ময়ে বধূর চোখ কপালে উঠিত।—সত্যি পার?

দেখ—বলিয়া দেবীদাস বধূকে ছোট্ট একটি তুলার পুঁটুলীর মতো শূন্যে তুলিয়া ধরিত। তারপর লুফিয়া টানিয়া বুকের মধ্যে আনিতে গেলে বধূ কাঁপিয়া চেঁচাইয়া উঠে।

তখন মাটিতে নামাইয়া দিয়া হাসিয়া দেবীদাস বলে—ভয় পেয়েছ বড্ড? তারপর সদয় কণ্ঠে বলে—আর ভয় দেব না।

একদিন দুপুর রাত্রে দু-জনে ঘুমাইয়া আছে। খুট-খুট শব্দ হইতেছে। বধূ জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে স্বামীর বুকের মধ্যে লুকাইল। ফিস্-ফিস্ করিয়া কহিল—শুনছ?

দেবীদাসেরও ঘুম ভাঙিয়াছে। আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল। বলিল—চোরে সিঁধ কাটছে বোধ হয়। কিছু ভয় নেই, তুমি আমায় ছাড় ত একটু, লক্ষ্মি—

অনেক করিয়া বধূকে সে ঠাণ্ডা করিল।

খন্‌-খন্‌, ভস্‌-ভস্‌—মাটি ঝরিয়া পড়িতেছে। ছোট সরু জানালা, তাহারই নীচে সিঁধ কাটিতেছে। অন্ধকারের মধ্যে অনেকক্ষণ তাকাইতে তাকাইতে দৃষ্টি খুলিয়া গেল। নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া দেবীদাস জানলার পাশে বসিয়া আছে। ক্রমে গর্ত্ত কাটা হইয়া গেল। খানিকক্ষণ চুপচাপ, তারপর একটা কাল মাথা সিঁধের মুখে ভিতরে আসিতেছে।

বধূ ব্যস্ত হইয়া আঙুল দিয়া দেখাইল—ঐ—

চুপ—বলিয়া দেবীদাস তাহাকে থামাইয়া দিল। বলিল—মানুষ নয়, ও লাঠির মাথায় কাল হাঁড়ি। আগে ঐ পাঠিয়ে পরখ করে, কেউ পাহারা দিয়ে বসে আছে কি-না। চুপ চুপ—

হাঁড়ি ঘরের মধ্যে অনেকখানি আসিয়া এদিকে-ওদিকে নড়িয়া চড়িয়া আবার বাহির হইয়া গেল।

আবার চুপচাপ। তারপর দেখা গেল, অতি সন্তর্পণে গর্ত্তের আলগা মাটির উপর দিয়া ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতেছে সত্যকার মাথা। অন্ধকারে দেবীদাসের মুখে তীক্ষ্ণ হাসি খেলিয়া গেল। চোর আর একটু আসিতেই তাহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া হো হো করিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

নিতান্ত ছেলেমানুষ চোর, একেবারে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—আমি কিচ্ছু জানিনে ঠাকুরমশাই, আমায় ওরা ঠেলে পাঠিয়েছে —আমি নতুন লোক—

–ওরা কারা ?

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল জন দুই-তিন দাওয়া হইতে উঠানে লাফাইয়া পড়িল।

দেবীদাস হাসিয়া বলিল—যা হতভাগা বেকুব বেল্লিক—আর কাঁদিসনে, যা চলে—

বলিয়া দোর খুলিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া পলায়মান একটি আবছা মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া দেবীদাস ছুটিল।

বাড়ির সীমা ছাড়াইয়া বিল। লোকটি ছুটিতে ছুটিতে বিলে গিয়া পড়িল। শুকনার সময়, বিলে জল-কাদার সম্পর্ক নাই। দেবীদাস তীরের মত ছুটিয়াছে। কাছাকাছি আসিয়া বলিল—আর পালাবি কতদূর? বিলে এসেই যে ভুল করলি, বেকুব গাধা কোথাকার। এখানে গা-ঢাকা দিবি কোথায়?

কিন্তু সে ভাবনা ভাবিবার আগেই চোর একটা উঁচু আ'ল বাধিয়া পড়িয়া গেল। দেবীদাস কাছে আসিয়া পড়িল, কিন্তু গায়ে হাত দিল না। বলিল—এখন ধরব না—ওঠ বেটা, ছোট্—শেষে তুই ভাববি, পড়ে না গেলে দেবীদাস রায় ধরতে পারত না—

লোকটি কিন্তু উঠিল না, পড়িয়া পড়িয়াই কাতরাইতে লাগিল। পড়িয়া গিয়া তাহার পা ভাঙিয়াছে। অতএব দৌড়িয়া ধরিবার বাসনা স্থগিত রাখিয়া দেবীদাস আপাতত চোরকে কাঁধে করিয়া আসিল।

দিন তিনেক ধরিয়া স্বামি-স্ত্রীতে বিস্তর তদ্বির করিয়া তাহাকে খাড়া করিয়া তুলিল।

একদিন বধূ জিজ্ঞাসা করিল—কি মতলবে এসেছিলি বাবা? —জানিস্ ত আমরা ভিখিরী বামুন—

অনেক রকমে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানা গেল, এদেশে গুজব রটিয়াছে—দেবীদাস রায় বিবাহ করিয়া সিন্দুক ভরিয়া বিস্তর টাকা আনিয়াছে। লোভে পড়িয়া অনেকে তাই নিশিরাতে এই বাড়ি হাঁটাহাঁটি করে—

বধূ বলিল—টাকা নয় রে বাবা সোনার তাল। সিন্দুকে সোনার গাছআছে—তাল তাল সোনার ফলন হয়···সে আমি দেখাব না ত—কিছুতেই না।

তারপর হাসিতে হাসিয়া সিন্দুকের ডালা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিল। অগণিত তালপাতার পুঁথি। তাহারই কয়েক বোঝা তুলিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সিন্দুকের ভিতর দেখাইল। অজস্র পুঁথি, তা ছাড়া আর কিছু নাই।

বধূ বলিল—আমার বাবা মস্ত বড় সার্ব্বভৌম পণ্ডিত, মরবার সময় সিন্দুক-বোঝাই এই সব ধনরত্ন দিয়ে গেছেন—এর এক টুকরা আমি কাউকে দিতে পারব না বাপু—

এক বছরের আগ-পাছ স্বামী-স্ত্রী অপুত্রক মরিলেন। দেবীদাসের

স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি সহায়রামে বর্তাইল। সহায়রামের পৈতৃক তেজারতির কারবার ছিল ; কিন্তু এক দুরারোগ্য রোগে সমস্ত মাটি করিয়া দিল। সহায়রাম পালা লিখিতেন—যাত্রার পালা, কীর্তন-কথকতার পালা—দুই কানে যাহা শুনিতেন, পালায় বাঁধিয়া বসিয়া থাকিতেন। বন্ধকী কাগজ-পত্র অন্দরে গিন্নির বাক্সে তালাবন্ধী হইয়া থাকিত, দেবীদাস রায়ের সিন্দুকটি কেবল সহায়রামের নিজস্ব সম্পত্তি—ওটি থাকিত বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে। ভোরবেলা সকলের আগে উঠিয়া আসিয়া সিন্দুকের উপর বসিয়া বসিয়া সুর ভাঁজিতেন। খাগের কলম ও হলদে কাগজের খাতা বাহির হইত। লোকজন আসিতে সুরু হইলে খাতা কলম আবার সিন্দুকে ঢুকিত।

প্রৌঢ় বয়সে সহায়রামকে বড় শোকতাপ পাইতে হয়। তিনটি ছেলে ওলাউঠায় মরিয়া গিয়া একেবারে নির্ব্বা নহইলেন। আগে যা একটু কাজকর্ম্ম দেখিতেন ইহার পরে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল—বড় একটা বাড়ির মধ্যেই আসিতেন না, সমস্ত দিন ও অনেক রাত্রি অবধি সিন্দুকের উপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। এক এক সময়ে গানের খাতা খুলিয়া সুর ধরিতেন, সুর খুলিত না, গলা আটকাইয়া যাইত, চোখের জল খাতার উপর টপ-টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িত।

এই সময়ে জগদ্ধাত্রীর জন্ম হয়।

মেয়ের যতদিন বিবাহ হয় নাই, মেয়ে ছাড়া কিছুরই খোঁজ রাখিতেন না। গিন্নি মারা গেলেন, মেয়ে শ্বশুর বাড়ি চলিয়া গেল,

সহায়রামের যাহা-কিছু ছিল মেয়ের বিবাহে উজাড় করিয়া দিয়া দিলেন —দিলেন না কেবল ঐ সিন্দুক। নিরালা খোড়ো ঘরে কর্ম্মহীন বৃদ্ধের জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত ঐ সিন্দুক ও গানের খাতা সম্বল হইয়া রহিল। উমানাথ সেই সময়ে রাতদিন বুড়ার সঙ্গে লাগিয়া থাকিত। তার অনেক দিন পরে সহায়রামের মৃত্যুর পর তাঁহাকেই গুরু বলিয়া ভণিতা দিয়া উমানাথ কবির দলে গান বাঁধিতে সুরু করিয়াছে।

পরদিন বেলা বোধ করি প্রহরখানেক হইবে, জগদ্ধাত্রী সন্তর্পণে পা ফেলিতে ফেলিতে ভিতরের উঠানে দাঁড়াইল। পরণে তাহার অতি জীর্ণ একখানি মটকার থান, স্নান হইয়া গিয়াছে, ভিজা চুলের উপর ফেরতা দিয়া আঁচল জড়ানো।

—কই গো মানুষ-জন কোথা ?

প্রথমটা জবাব আসিল না। আরও দু-একবার ডাকাডাকি করিতে তরঙ্গিণী বাহির হইল। দাওয়ায় পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া মুখ কালো করিয়া প্রণাম করিতে আসিল। জগদ্ধাত্রী তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া বলিল—ছুঁয়ে দিও না, দিদি। তোমাদের কর্ত্তাদের সঙ্গে কাজ রয়েছে,

কাজ সেরে এই পথে অমনি মঠবাড়ির মচ্ছবে যাব। তুমি ত উমানাথের বউ—বাড়ির গিন্নি হয়েছ এখন। দেখি—দেখি—…সেদিনকার উমানাথ—তার আবার বউ, সে হ'ল গিন্নিঠাকরুণ—বলিয়া হাসিতে গিয়া তেমন করিয়া হাসিতে পারিল না। বলিল—কি সুন্দর সোনার সংসার আগলে বসে আছিস বউ, দেখে যে হিংসে হয়।

সেজবৌ ও ছোটবৌ ঘাটে গিয়াছিল। সমস্তটা ঘাটের পথ বক-বক করিতে করিতে এখন আসিয়া রান্নাঘরে কাঁখের কলসী নামাইল। অচেনা মানুষ দেখিয়া কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া গেল। জগদ্ধাত্রী ডাকিল—ইদিকে আয়, ঘোমটা দিচ্ছিস যে বড়। আমায় কুটুম্ব ঠাওরালি নাকি? মুখ তোল্—তোল শিগ্‌গির—

ঘোমটা টানিয়া খাস্ত সভ্যভব্য হইয়া থাকা ছোটবৌর পক্ষেও দুরূহ ব্যাপার। মুখ তুলিয়া একবার চাহিয়া আবার সে ঘাড় নামাইল।

জগদ্ধাত্রী বলিল—আমার যে ছোঁবার যো নেই, ওগো ও গিন্নি-ঠাকরুণ, এখানে এসে দে দিকি এই দুষ্টু মেয়ে দুটোর পিঠে দুটো কিল বসিয়ে—

তরঙ্গিণী আসিয়া উভয়ের ঘোমটা খুলিয়া দিল। খুশী হইয়া জগদ্ধাত্রী বলিতে লাগিল—বাঃ বাঃ চাঁদের মত মেয়ে—লক্ষ্মী-সরস্বতী দুটি বোন।…হ্যালো, ও মেয়েরা, টিপিটিপি হাস্‌ছিস্ যে বড়। জানিস্ আমি কে?

বধূরা বোকা নয়। ছোটবৌ বলিল—আপনি পিসিমা—

কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া জগদ্ধাত্রী বলিল—জবাব শোন না একবার। পিসিমা! গুণের নিধি শ্বশুরঠাকুর বলে দিয়েছেন বুঝি? কেন শুধু মা হ'লে দোষটা কি? হ্যাঁরে, মা বেঁচে আছেন ত?

ছোটবধূর মুখ মলিন হইয়া গেল।

জগদ্ধাত্রী বলিল—নেই? খেয়ে-দেয়ে অবসর হয়েছিস্?

নানা কথায় বেলা বাড়িয়া আসিল। বহুকাল পূর্ব্বে যখন এ-যুগের এই সব নূতন মানুষের দল পৃথিবীকে দখল করিয়া বসে নাই, তখন এই গ্রামের মধ্যে এই বাড়ির চতুঃসীমায় এই উঠানের ধূলার উপর অতীতের আর এক দল কিশোর-কিশোরী দিনের পর দিন যে-সব হাসি ও অশ্রু ছড়াইয়া বেড়াইত সেই ক্ষীণ বিস্মৃত কণিকাগুলি একজনে কুড়াইয়া ফিরিতেছে, আর দুই জন তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া একেবারে মগ্ন হইয়া বসিয়া আছে। হঠাৎ বাহিরে অনেকগুলি গলার আওয়াজ শুনিয়া জগদ্ধাত্রী চুপ করিল।

ছোটবউ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—গল্পে গল্পে ফাঁকি দিয়ে কত বেলা করে দিলাম, আপনি কিচ্ছু টের পান নি। এত বেলায় মচ্ছবে গিয়ে আর হবে কি?

জগদ্ধাত্রী উত্তর করিল না। কান পাতিয়া ক্ষণকাল বাহিরের কথাবার্ত্তা শুনিয়া একসময়ে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—জয়ের গলা

চিনিস তোরা ? ও কি হৃদয় কথা বলছে ? উঁহু—এখনও এলো না আচ্ছা মানুষ !

মেজবৌ বলিল—আপনি বসে বসে গল্প করুন মা, আমি কাপড় ছেড়ে জলটল এনে দিচ্ছি, তার পর রান্না চাপিয়ে দেবেন। বেশ ত হচ্ছিল···আপনি ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন—

মৃদু হাসিয়া জগদ্ধাত্রী বলিল—গল্প করব ব'লে আসিনি মা, রান্না করব বলেও আসিনি···এসেছি কাজে। হৃদয়ই মুস্কিল করলে। ক্ষণ পরে বলিল—বাড়িতে ট্যা-ভ্যা করছে না—তোদের বুঝি সে পাট হয় নি এখনও ?

ছোটবৌ ভালমানুষের মত মেজবৌকে দেখাইয়া কহিল—হয়েছে মেজদির একটা— সাত বছরের ছেলে। মেজদি নিজেও এবার পনোরয় পড়েছে।

তাহার কানের পাশে কতকগুলি চুল উড়িতেছিল, খপ করিয়া তাই ধরিয়া আচ্ছা করিয়া টানিয়া মেজবৌ ছোটবৌকে শাস্তি দিল। সম্পর্কে ছোট জা, বয়সেও বোধ করি কিছু ছোট, শাস্তির কষ্টে সে হাসিয়া ফেলিল।

মেজবৌ বলিতে লাগিল—ছেলে একলা আমার নয় মা, ওর-ও। বল্ তুই আভা, ছেলে তোর নয়। বল্—

আভা তাহা বলিতে পারিল না। বলিল—ছেলে আমাদের তিন শাশুড়ী-বৌয়ের। বলিয়া রান্নাঘরে তরঙ্গিণীর উদ্দেশে হাত তুলিয়া

দেখাইল। বলিতে লাগিল—বড়-জা মারা যাবার থেকে নিতু থাকত মামার বাড়ি। গেল বছর এখানে এসেছে। সেই থেকে আদর দিয়ে দিয়ে মেজদি ওকে যা ক'রে তুলেছে—

মেজবৌ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—আর তুই বড্ড ভাল, না? মিথ্যে কথা বলিসনে আভা, তা-হলে তোর সমস্ত কীর্ত্তি ব'লে দেব এক্ষুনি। জগদ্ধাত্রীর দিকে চাহিয়া হঠাৎ আর এক প্রশ্ন করিল—আপনার ছেলে-মেয়ে নেই?

স্মিত মুখে জগদ্ধাত্রী কহিল—কে বললে নেই? এই ত কতগুলি রয়েছিস তোরা—

উঠানের প্রান্তে ডালপালায় আচ্ছন্ন ছোট একটি পেয়ারা গাছ। সহসা নজরে পড়িল, গাছের নীচের দিককার ডালপালাগুলি ভয়ানক আন্দোলিত হইতেছে। সর্ব্বাগ্রে নজর পড়িল মেজবৌয়ের।

—কেরে? দু-একটা কুশী পড়েছে, হতভাগাদের জ্বালায় থাকবার জো নেই। কেরে তুই, কথা বলিসনে?

ছোটবৌ আগাইয়া উঁকি দিয়া দেখিয়া কহিল—আবার কে? সেই ডাকাত। ইস্কুল-টিস্কুল এর মধ্যে হয়ে গেছে তোমার? কখন এসে সুড়-সুড় করে গাছে চড়ে বসেছ…নেমে এস এক্ষুনি—

. ডাকাত বিনাবাক্যে নামিয়া আসিল। বাড়ির মধ্যে একমাত্র ছোটকাকীকে সে যৎকিঞ্চিৎ সমীহ করিয়া থাকে।

ছোটবৌ বলিতে লাগিল—সে দিন মানা করে দিইছি, তবু ডালে ডালে হনুমানের মত লাফাতে লেগেছ—হাত-পা ভেঙে পড়ে মরবে যে কোন্ দিন—

উচ্চকণ্ঠে পাড়া জানাইয়া বিশেষতঃ একজন বাহিরের লোকের সামনে এই প্রকার তুলনামূলক আলোচনায় নিতাই অপমান জ্ঞান করিল। ঘাড় ফিরাইয়া হাত তুলিয়া বলিল—মাব্ব।

ছোটবৌ হাসিয়া বলিল—ইস্—কত বড় মুরোদ! আয় দিকি কাছে এগিয়ে, কে কাকে মারে···আয়—

নিতাই আর আগাইল না, তা বলিয়া পরাজয় স্বীকারও করিল না। স্বস্থানে দাঁড়াইয়া বীরোচিত ভঙ্গিতে পুনশ্চ কহিল—মাব্ব—

জগদ্ধাত্রী উঠানে নামিয়া আসিল। কহিল—গুরুজনকে মারতে চাচ্ছ···এই তোমার বুদ্ধি হয়েছে খোকা, ছিঃ—

এবারে খোকার নজর পড়িল জগদ্ধাত্রীর উপর।—মাব্ব—বলিয়াই বোধ করি তাহার মনে হইল ভয় দেখাইবার এই মামুলী কথায় তেমন আর জোর বাঁধিতেছে না। সহসা আর এক পন্থা ধরিল, বলিল—দে, আমার রেলগাড়ী দে—

—কাল যে দিলাম—

—সে ছাই গাড়ী। কলের গাড়ী দিবি বলেছিলি, দে এক্ষুনি।

জগদ্ধাত্রী হাসিতে হাসিতে বলিল—রেল গাড়ী আমি গড়াই নাকি? মেলার থেকে কিনে ত দেব—

অতএব জগদ্ধাত্রী নিতান্তই বে-কায়দায় পড়িয়া গিয়াছে। দে এক্ষুনি—বলিতে বলিতে উদ্যত হাতে নিতাই তীরবেগে ছুটিয়া আসিল।

ছোটবৌ তাড়া দিয়া উঠিল—খবরদার, ছুঁয়ে দিও না ওঁকে —শুদ্ধ কাপড়চোপড় প'রে মঠবাড়ি যাচ্ছেন—

নিতাই ছুঁইল না। থুঃ থুঃ করিয়া মুখের সমুদয় চিবানো পেয়ারা জগদ্ধাত্রীর গায়ে ঢালিয়া দিল। দিয়াই পলাইতেছিল, জগদ্ধাত্রী ধরিয়া ফেলিয়া ঠাস্-ঠাস্ করিয়া পিঠে দিল দুই চাপড়। প্রবল চীৎকারে নিতাই আছড়াইয়া মাটিতে পড়িল।

তরঙ্গিণী কোথায় ছিল, হাঁ-হাঁ করিয়া আসিল। সকলের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া বিনাবাক্যে সে ছেলে কাড়িয়া লইয়া গেল। ঘরের মধ্যে গিয়া নিতুর কান্না থামিল। তাহাকেই সম্বোধন করিয়া তরঙ্গিণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিতে লাগিল—আর যদি কারও কাছে যাস্, হতভাগা ছেলে, মেরে একেবারে খুন করে ফেলব। শত্তুরের হাতে ছেলে ফেলে দিয়ে সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখে—

তাহার পর কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতা। কোন দিক দিয়া কোন সাড়া আসিল না দেখিয়া এবারে তরঙ্গিণী ঘরের আড়াথুটিগুলিকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল—মিছরির ছুরি! গ্রামসুদ্ধ মানুষ ডাকাডাকি, কি সমাচার?—না জমিদারী তালুকদারী সমস্ত ফাঁকি দিয়ে খাচ্ছে, তার

সালশী হবে। আবার ইদিকে বাড়ির ভিতরে এসে কত রঙ্গরস! ছেলে খুন করবার মতলব—ধনে প্রাণে মারতে এসেছে আমাদের।

মেজবৌ কখন উঠিয়া গিয়াছে। ছোটবৌ মুখ লাল করিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল। জগদ্ধাত্রী কথা কহিল, কিন্তু কণ্ঠস্বরে উত্তাপ নাই, বলিল—ছেলেকে অত আদর দিও না বউ, একটু শাসন করলে ছেলে খুন হয়ে যায় না—

ঘরের মধ্য হইতে জবাব আসিল—পেটের ছেলেকে শাসন করুক গিয়ে লোকে—

ম্লান হাসি হাসিয়া জগদ্ধাত্রী বলিল—তা যে নেই।

মুখের কথা কাড়িয়া তরঙ্গিণী বলিতে লাগিল—ভগবান দেয় নি। সে অন্তর্যামী—সব বোঝে, খুনে মেয়েমানুষের কোলে দেবে কেন? যে যেখানে ছিল সব শেষ করে এখন আমার সংসারে নজর দিতে এসেছে—

—কি, কি বললি? জগদ্ধাত্রী বাঘিনীর মত উঠিয়া চক্ষের পলকে উঠানের এই প্রান্ত অবধি আগাইয়া আসিল। বলিতে লাগিল—বুঝি গো বুঝি, খাওয়া জিনিষ উগের দিতে বড্ড লাগে। কিন্তু এত দেমাক? দর্পহারী আছেন, এখনও চন্দ্রসূয্যি আছে। আমি আর কি বলব? গলা আটকাইয়া আসিল, সামলাইয়া লইয়া বোধ করি যাহাতে সেই দর্পহারীর কান পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে এমনি উচ্চকণ্ঠে কহিতে লাগিল—ছেলের দেমাকে মরে যাচ্ছিস্, তবু যদি নিজের ছেলে হ'ত! খোঁটা

মাথুর

'দেবার জিনিষ এ নয় বউ, এক দণ্ডে কার কি হয়ে যায় কেবল ঐ উপর-ওয়ালা জানে—

মুহূর্তের জন্য জগদ্ধাত্রীর বোধ করি একটি অতি চরমক্ষণের কথা মনে পড়িয়া গেল। বিয়ে তখন তার খুব বেশী দিন হয় নাই। নূতন গিন্নীপনার আনন্দে লজ্জায় তখন দিনগুলি উড়িয়া চলিয়া যায়। জগদ্ধাত্রী ছ-মাসের অন্তঃসত্ত্বা। স্বামী কণ্ট্রাক্টরী কাজ করিতেন, দুপুরের পর দিব্য পান চিবাইতে চিবাইতে ভালমানুষ বাহির হইয়া গেলেন, ঘণ্টা দুই পরে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিল। সর্ব্বাঙ্গ রক্তে ভাসিতেছে, চক্ষু মুদ্রিত, এক উঁচু পাঁচিলের উপর হইতে পড়িয়া গিয়া প্রাণটুকু ধুকধুক করিতেছিল, বাড়ি আনিবার পথে তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। জগদ্ধাত্রী আছাড় খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল; একবার জ্ঞান হয়, আবার তখনই অজ্ঞান হইয়া পড়ে। পরের দিন প্রসব করিল অপরিণত একটি রক্তপিণ্ড, মানব-শিশু বলিয়া তাহাকে চিনিবার জো নাই। মিছা কথা নয়,—মিছা কথা নয়; মা হইয়া নিজের শিশুকে সত্যই সে খুন করিয়াছে। তারপর কতদিন গিয়াছে, এখনও মাঝে মাঝে সেই সব মনে পড়িয়া দৃষ্টি তাহার ঝাপ্‌সা হইয়া আসে।...

বাহিরে তখন অনেকগুলি কণ্ঠ চীৎকারের যেন প্রতিযোগিতা চালাইয়াছে। হৃদয় ব্যস্ত হইয়া আসিয়া ডাকিল—দিদি, আসুন তো

শিগ্‌গির। তারপর হাসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিতে বলিতে চলিল—আচ্ছা এক মজা হয়েছে। বিপিন চক্কোত্তি-টক্কোত্তি সবাই হাজির, তারই মধ্যে ক্ষেত্তোর-দা আপনাকে সাক্ষী মেনে বসেছেন। এইবার আপনি সব কথা বলুন গিয়ে—

ক্লান্তি জগদ্ধাত্রীর মুখের উপর আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। করুণ-কণ্ঠে বলিল—ওর মধ্যে আর আমাকে কেন? আমি বাইরেয় দিকে থাকব। তুমি যা হয় কর গিয়ে হৃদয়, ঐ গণ্ডগোলে আমাকে টেনো না—

—সে কি? হৃদয় আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—গণ্ডগোল কোথায়? এত ঠিকঠাক ক'রে শেষকালে পিছিয়ে গেলে চলে? বলিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল। বলিতে লাগিল—আমার দিদি, এক কথা। ষাটটি টাকা দেব, নগদই দেব,—কাল চান কালই পাবেন। আপনি গিয়েই ঘর মেরামত আরম্ভ করতে পারবেন। কিন্তু দশজনের মোকাবেলা জমিটা নির্গোল হওয়া চাই—

একটু চুপ থাকিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া আবার বলিল—বাপের বাড়ির গ্রাম—কার সামনে বেরুতে লজ্জা হচ্ছে ঠিক করে বলুন ত? ক্ষেত্তোর-দা রয়েছেন ব'লে বুঝি তাই—

তীক্ষ্ণস্বরে জগদ্ধাত্রী বলিয়া উঠিল—আমি কাউকে গ্রাহ্য করি নে, চল—

গ্রামের অনেকেই আসিয়াছেন। বিপিন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বয়সে সকলের বড়; এতক্ষণ যা কথাবর্ত্তা হইয়াছে জগদ্ধাত্রীকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন। মাঝখানে হৃদয় বাধা দিয়া বলিল—ও সেটেলমেণ্টের কথা ধরবেন না আপনারা, ট্যাকে দু-পয়সা গুঁজতে পারলে 'হয়'কে স্বচ্ছন্দে 'নয়' করা যায়। সহায়রাম জেঠার বসতবাড়ি ছিল সিদ্ধ নিষ্কর। তিনি মারা যাবার পর ঘরদোর পড়ে গেল, ভিটের উপর এক হাঁটু জঙ্গল হয়ে পড়ল। তারপর ক'বছর পরে ক্ষেত্তোর-দা ওঁর উত্তর-বাগের বেড়াটা ঘুরিয়ে ও জমিটাও ঘিরে ফেললেন। আমি বললাম—ক্ষেত্তোর-দা, কাণ্ডটা কি? জবাব দিলেন—ওরা দেশে ঘরে এসে যখন দাবি করবে তখন ছেড়ে দেব; পোড়ো জায়গাটুকু বেড়া দিয়ে নিলে ওদিকে মজা দীঘি পড়ে যায়, দু-পাশে আর বেড়া বাঁধতে হয় না, অনেক খরচ আসান হয়।...তখন কেউ আর বাদী হয় নি, এসে ঝগড়া করতে কার মাথা ব্যথা পড়েছে? এবার জগদ্ধাত্রী দিদি তাঁর পৈতৃক ভিটে চাচ্ছেন—অনাথা বেওয়া মানুষ, আপনারা দশ জনে বিচার করুন—

ক্ষেত্রনাথ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—মিথ্যে কথা—

বিপিন চক্রবর্ত্তী বলিলেন—তা হলে তুমি যা বলবে, বল ক্ষেত্তোর নাথ—

ক্ষেত্রনাথ ক্রুদ্ধকণ্ঠে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—আমি কিছু বলব না চক্কোত্তি মশায়, আমি ত বলেছি—আমি এক কথাও বলব না।

ও-ই বলুক। উত্তেজনার বশে স্বর কাঁপিতে লাগিল; বলিলেন—হৃদয়ের সঙ্গে যোগ-সাজস ক'রে বড় আজ বাদী হ'তে এসেছে, ও বলুক আজ আপনাদের দশজনের সামনে—ওর বিয়ের পরদিন, ফাল্গুন মাসের সতের তারিখ···তারিখটা পর্য্যন্ত আজো মনের মধ্যে আঁকা রয়েছে কুলীন বর-যাত্রীরা বেঁকে বসল, মর্য্যাদা না পেলে খাওয়া-দাওয়া করবে না, সহায়রাম খুড়ো চোখে অন্ধকার দেখলেন—সেই সময় কে রক্ষে করলে? বল জগদ্ধাত্রী, বল—মনে আছে সে সব দিনের কথা? আমার মার' বাজুবন্ধ কেশব দত্তের কাছ বন্ধক দিয়ে চল্লিশ টাকা এনে দিলাম, সহায়রাম খুড়ো আমার হাতখানা ধ'রে কেঁদে ফেল্লেন। বল্লেন, মেয়ে আমার রাজার ঘরে গেল—সে কিছু নিতে থুতে আসবে না। তোমার এ টাকা শোধ করতে পারি ভাল, না পারি জমাজমি বাড়ি-ঘর-দোর সমস্ত তোমার। থাকত যদি কেশব দত্ত বেঁচে, সে বলত; এখন ও-ই বলুক—

জগদ্ধাত্রী আগড়ের বাঁশ ধরিয়া অন্য দিকে চাহিয়াছিল, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন···বল সব। সহায়রাম কাকা মাদুরে বসে, তুমি খাটের পাশে দাঁড়িয়েছিলে লাল বেনারসী পরে। অনেক বরযাত্রী বউ দেখতে এল সেই সময়—বল তুমি, সে সত্যি নয়; আমি এক কথায় সমস্ত ছেড়ে দিচ্ছি।

জগদ্ধাত্রী কথা বলিল না, তেমনি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জবাব দিল হৃদয়। বলিল—কিন্তু আমরা শুনেছি, সে টাকা শোধ হয়ে

গিয়েছে ; তা ছাড়া চল্লিশ টাকায় অতটা নিষ্কর জমি হ'তে পারে না।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—তোমরা স্বপ্নে শুনেছ। চল্লিশ টাকা কি বলছ—কেশব দত্তের কাছ থেকে বন্ধক ছাড়িয়েছিলাম তার ডবল আশী টাকা দিয়ে। তার উপর আরও কত বছর হয়ে গেল, সুদের সুদ তস্য সুদ ধরব না? কত টাকা হয় তা হলে? সিকি পয়সা রেহাত দিচ্ছিনে। একটু থামিয়া বলিতে লাগিলেন—আজ হৃদয় তোমার বড় আপনার হ'ল জগদ্ধাত্রী, কোথায় ছিল সেদিন ওরা? ওর বাপ বরদাকান্ত ত সেইখানেই ছিলেন, চল্লিশটা পয়সা দিয়ে কোন সুহৃৎ সাহায্য করে নি।

জগদ্ধাত্রী একবার হৃদয়ের মুখের দিকে চাহিল। তারপর বলিল—বাবা কেশব দত্তের টাকা শোধ ক'রে দিয়েছিলেন—

অগ্নিদৃষ্টিতে চাহিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—তোমার কাছে টেলিগ্রাফ হয়েছিল বুঝি?

—বাবা চিঠি লিখেছিলেন!

—দেখাও চিঠি—

জগদ্ধাত্রী একটু ইতস্তত করিয়া কহিল—এত দিনের চিঠি···তাই কি থাকে?

ক্ষেত্রনাথ অধীর কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—থাকে, থাকে—সত্যি হ'লে সমস্ত থাকে। আমার কাছে টুকরা কাগজখানি অবধি রয়েছে! পাঠশালে যে দাগা বুলিয়েছি তা পর্য্যন্ত বের ক'রে দেখাতে পারি।

বলিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—এত কথা শিখিয়ে দিতে পেরেছ হৃদয়, আর একখানা চিঠি যেমন-তেমন করে জোগাড় করে রাখতে পারনি ?

হৃদয়ও মহাক্রোধে সমুচিত জবাব দিতে যাইতেছিল, নিবারণ মজুমদার মধ্যবর্ত্তী হইয়া কলহ থামাইয়া দিল। নিবারণ কহিল—মোটের উপর আপনি কিন্তু ঠকে গেলেন চাটুজ্জে মশায়, জগদ্ধাত্রী ঠাকরুণকে সাক্ষী মেনেছিলেন আপনিই—

ক্ষেত্রনাথ সে কথা আমলেই আনিল না। হাতমুখ নাড়িয়া কহিতে লাগিলেন—কিসের ঠকা ? ও মিথ্যেবাদী, মহাপাপী—যা বলবে তাই হবে নাকি ? আইন-আদালত রয়েছে, মামলা করে নিক্‌গে। আমার আজ চল্লিশ বছরের দখল, গ্রামের সমস্ত লোক দেখছে, মিথ্যে বলে ও ত কেবল নিজের পরকাল খোয়ালে—আমার কি ?

নিবারণ কহিল—গ্রামের সব লোক আপনার দিকে সাক্ষী দেবে তাই বা কি করে জান্‌লেন ?

ক্ষেত্রনাথ কহিলেন—দিও ঐ দিকে সাক্ষী ;—গ্রাহ্য করিনে। এটা কোম্পানীর রাজত্ব—আমার দলিল রয়েছে, জরিপের রেকর্ড—তার উপর মতি বিশ্বেসের মেয়াদী কবলুতি। বিপিন চক্রবর্ত্তীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—চক্কোত্তি মশায়, আপনি বসুন একটু। যখন পায়ের ধুলো পড়েছে মতি বিশ্বেসের কবলুতিটা একবার দেখে যান—

দ্রুতপায়ে ক্ষেত্রনাথ ঘরে গেলেন।

ঘরের কোণে দেবীদাস রায়ের সিন্দুক বিছানায় বালিশে বিলুপ্ত হইয়া রহিয়াছে, কোন চিহ্ন নজরে পড়ে না।

ক্ষেত্রনাথ দলিলের দুই নম্বর বাক্স খুলিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে কবলতি লইয়া বাহিরে আসিলেন।

—দেখুন, দেখুন, রেজেষ্ট্রীর তারিখটা হ'ল কোন্ সাল ? হিসেব করে দেখুন, তেত্রিশ বছর হয়ে গেছে। বিশেস জঙ্গল কেটে চাষবাস করবে এই চুক্তিতে মেয়াদী বন্দোবস্ত। আপনি ত বৈষয়িক লোক—বলুন এবার দখলি-স্বত্ব প্রমাণ হয় কি না ?

ফিরিবার পথে বিপিন চক্রবর্ত্তী কহিতে লাগিলেন—আমি বুড়ো-মানুষ, অনর্থক আমাকে এই সব হাঙ্গামে টেনে আনা। কেঁদে কবুবি কি মা জগদ্ধাত্রী, ওর আর কোন উপায় নেই। বাঘের মুখ থেকে মানুষ ফেরে, কিন্তু ক্ষেত্তোর চাটুজ্জের হাত থেকে বিষয়-সম্পত্তি ফিরেছে কেউ কোনো দিন শোনে নি। সেবারে কি হল, ঐ বাসুল-ভাঙার ভড়েদের সঙ্গে ? ভড়েদের সেজবাবু এত লাফালাফি, হেনো করেঙ্গা, তেনো করেঙ্গা—শেষকালে দেখি ক্ষেত্তোরনাথ ওয়াশীলতমুদ্ধ আদায় করে নিলে। মনে পড়ছে না হে নিবারণ ?…

বিকালবেলা ক্ষেত্রনাথ সেই চণ্ডীমণ্ডপেই বসিয়াছিলেন। মাদুরের উপর একদল প্রজা-পাটক। গোমস্তা রাখাল হাতি দাখিলা লিখিয়া টাকা লইতেছিল। নানারূপ গল্প হইতেছিল, বিশেষ করিয়া ও-বেলাকার বিজয়কাহিনী। রাখাল একবার মুখ তুলিয়া বলিল—ঠাকরুণের শ্বশুরবাড়িরা ত খুব ধনী লোক—

হা—হা করিয়া হাসিয়া ক্ষেত্রনাথ কহিলেন—খুব ধনী—বুঝলে, একেবারে রাজা রাজবল্লভ। আমার ভায়া একদিন গেছলেন সেখানে। তার মুখে রাজবাড়ির বর্ণনা পাওয়া গেল। ভাঙা পাঁচিলের উপর এক-খানা দোচালা, নারকেল পাতার ছাউনি, অগুন্তি ফুটো। শুয়ে শুয়ে দিব্যি চাঁদের আলো পাওয়া যায়—

রাখাল বলিল—দেশেও ত ওদের বিস্তর জমিজমা ছিল, সে সব কি হয়ে গেল?

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—দেনাও ছিল একরাশ। সবাই মরে হেজে গেল, মহাজনেরা আর সবুর করলে না। এখন থাকবার মধ্যে ঐ দোচালা অট্টালিকা আর বিঘেখানেক আমবাগান—

বলিতে বলিতে হাসির মধ্যে অকারণেই ক্ষেত্রনাথ রুখিয়া উঠিলেন—কিন্তু আমি এই ব'লে দিলাম রাখাল, আমার কাছে যেন সিকি পয়সার প্রত্যাশা না করে। তোমাকে হুকুম দেওয়া রইল, উমানাথ হোক আর সে নিজেই হোক যদি এসে প্যানপ্যান করে—সিকিপয়সার সাহায্য না পায়। ঘাড় ধরে বের করে দিও—মিথ্যেবাদী

হাড়বজ্জাত সব ! ব্যবহারটা কি রকম দেখলে ? টাকার অভাব হয়েছে··· আগে যদি আসত আমার কাছে, এসে কেঁদে কেটে পড়ত, আমি কি ফেলে দিতে পারতাম, না দিইছি কোন দিন ?

রাগের বশে এ কথাটা মনে পড়িল না, জগদ্ধাত্রী সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই অন্ততঃ পনর-বিশখানা চিঠি লিখিয়াছে।

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। বাহিরবাড়ির সীমানায় ঘন সন্নিবিষ্ট তল্‌তা বাঁশের ঝাড়, তার ওদিকে রাস্তা, রাস্তার পরপারে সহায়রাম রায়ের সেই পোড়ো ভিটা বাড়ি। সেখানে আজকাল সরিষাক্ষেত ; হলুদ বরণ অজস্র ফুল ফুটিয়াছে। ক্রমে দু-একজন করিয়া লোক কমিতে আরম্ভ করিল। কি কথায় উঠিল, বাতাবী লেবুর গল্প ; হইতে হইতে আধমুণে কৈলাস। এই কৈলাসটি কে, কোথায় তাঁর জন্ম, সে খবর কেউ জানে না। গল্প আছে, আধ মণের কমে তাঁর পেট ভরিত না। একবার কোন রাজবাড়িতে তিনি অতিথি হন। বিকাল-বেলা সরকার মহাশয়ের কানে গেল, ব্রাহ্মণ তখন পর্য্যন্ত অভুক্ত। বৃত্তান্ত কি ? অতিথিশালায় ছুটিয়া আসিয়া দেখেন, সিধায় যে আধ-সেরখানেক চাউল দেওয়া হইয়াছিল, কৈলাসচন্দ্র স্নানাদির পর সে-ক'টি মুখে ফেলিয়া এক ঢোক জল খাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, আর কি করিবেন ?

সেকালের কথা কহিতে কহিতে অকস্মাৎ ক্ষেত্রনাথ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন

—কি দিনকালই ছিল! স্বর্গে গেছেন তাঁরা, সে-সব মানুষও আর আসবে না—তেমন হাসি-ফূর্তি হবে না কোন দিন। একটা নিঃশ্বাস চাপিয়া বলিতে লাগিলেন—মনে হয় যেন কালকের কথা, স্পষ্ট চোখের উপর ভাসছে···কিন্তু কোথায় বা কে?

আরও ঘোর হইয়া আসিল। রাখাল কাগজপত্র তুলিয়া রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষেত্রনাথও আসিলেন। হঠাৎ যেন তাঁহার নজরে ঠেকিল, আবছা মতন একটা লোক অতিশয় মন্থর গমনে রাস্তা পার হইয়া গরিবাক্ষেতে ঢুকিয়া পড়িল।

—দেখ ত, দেখ ত, একবার রাখাল।

অত দূর অবধি স্পষ্ট করিয়া ঠাহর হয় না, তবু যেটুকু নজরে পড়িল তাহাতেই ক্ষেত্রনাথ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—নিশ্চয় বাইতি-পাড়ার সৈরভী, বদমায়েসের ধাড়ী। ভেবেছে অন্ধকার বুড়ো দেখতে পাবে না কিছু—

কাঁপিতে কাঁপিতে লাঠি লইয়া নিজেই নামিয়া পড়িলেন। সামনে উমানাথকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন—ছুটে যাও, গিয়ে ঐ মাগীর চুলের মুঠো ধরে নিয়ে এস এখানে। তোলাচ্ছি আমি সর্ষে ফুল হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এস—

উমানাথ বলিল—উনি জগদ্ধাত্রী দিদি। মঠবাড়ির মচ্ছব থেকে ফিরে এলেন এতক্ষণে—

ক্ষেত্রনাথ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—নবদ্বীপের মা-গোঁসাই

এলেন! বের ক'রে দিয়ে এসগে। মামলা ক'রে দখল নিয়ে তারপরে যেন আমার ক্ষেতে ঢোকে।

উমানাথ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ক্ষেত্রনাথ কিছু কাল গুম হইয়া থাকিয়া বলিলেন—ঘরভেদী বিভীষণেরা সব পিছনে আছ, তা বুঝেছি। গালমন্দ না দিতে পার গিয়ে ভাল কথায় কি বলা যায় না—দিদি, যা তুলেছ তুলেছ—আর তুলো না; এখন ফুল তুললে সর্ষের ফলন হবে না—

উমানাথ কহিল—উনি সর্ষেফুল তুলছেন না। ভিটের উপর গিয়ে আছড়ে পড়লেন—কাঁদাকাটা করছেন না, কিছু না। দুপুর বেলাতেও ঐ রকম আর একবার দেখেছি।

আরও খানিক দাঁড়াইয়া উমানাথ আবার কহিল—আমি বললে কি যাবেন? আপনি গিয়ে একবার দেখে আসুন।

অর্থাৎ স্থূলকথা, তাহার দ্বারা এ-কাজ হইবে না। ক্ষেত্রনাথ তখন পায়ে পায়ে নিজেই চলিলেন।

সরিষা-ক্ষেতের এক পাশে বড় একটি দেবদারু গাছ,তাহার গোড়ায় আসিয়া দেখিলেন—অনতিস্পষ্ট জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, সেই আলোকে প্রথমটা নজরে আসিল না—তারপর দেখিলেন,—হলুদ-বরণ ফলের মধ্যে সাদা কাপড়ে ঢাকা আবছা একটি মূর্ত্তি মাটির উপর একেবারে ডুবিয়া

আছে। ক্ষণকাল চুপ থাকিয়া ক্ষেত্রনাথ মনে মনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন ; কথা বলিতে হয়, তাই যেন বলিলেন—কেও ? জগো ?

জগদ্ধাত্রী চমকিয়া উঠিয়া গভীর কণ্ঠে ডাকিল—পণ্টু দা !

সেইখানেই ক্ষেত্রনাথ বসিয়া পড়িলেন। দুইজনে চুপচাপ। চল্লিশ বছর পরে মুখোমুখি বসিয়া কিসের নেশায় মন ঝিমাইয়া আসিতেছে।···

হলুদ রঙের ফুলেভরা জনশূন্য নিস্তব্ধ ক্ষেতের উপরে আলতারাঙা পা ফেলিয়া ঘরের লক্ষ্মীরা এঘরে ওঘরে সন্ধ্যা দেখাইয়া ফিরিতে লাগিলেন। সামনের আশশ্যাওড়া ও ভাটের জঙ্গলের উপর দেখিতে দেখিতে গড়িয়া উঠিল, দক্ষিণী কারিগরের তৈরি প্রকাণ্ড আটচালা ঘর একখানি ! ভিতরে জোড়া তক্তপোষে ফরাসের উপর ঝকঝকে সাপের মাথায় হুঁকাদান, তার উপর রূপার্বাধান হুঁকা ; কলিকায় তামাক পুড়িয়া যাইতেছে, ও পাড়ার বৈকুণ্ঠ চাটুজ্জে হাত বাড়াইয়াছেন, কিন্তু হুঁকার নাগাল পান নাই। পাশার দান পড়িতেছে, চীৎকারে ঘর কাঁপিয়া যাইতেছে, ফিরিয়া তাকাইবার ফুরসৎ কাহারও নাই। বৈকুণ্ঠ আসিয়াছেন, কেদারনাথ বরদাকান্ত আসিয়াছেন, আরও কে কে যেন—নজর যায় না। বাড়ির মধ্যে দমাদম ঢেকির পাড় পড়িতেছে, নাড়ু-ভাজার গন্ধ—কানে পৈতা জড়ানো ফর্সা রঙ কে খড়ম খট্‌খট্ করিতে করিতে দীঘির ঘাট হইতে এই দিকে আসিতেছে। কে ডাকিয়া উঠিল—ও জগো, ঘুমুসনি—ওঠ, দুটো খেয়ে নিগে আগে, তারপর—

চুপ, চুপ, চুপ! নিঃশ্বাসেরও যেন শব্দ না হয়, উহারা কত কি কথা কহিতেছে—ভাল করিয়া শুনিতে দাও···

অনেকক্ষণ পরে ক্ষেত্রনাথ বলিয়া উঠিলেন—কেন তখন অত বড় মিথ্যে কথা বললে? হৃদয় তোমার আপনার হ'ল? ঘর সারাবার টাকার দরকার—আমায় যদি আগে ভাল ভাবে বলতে জগো, দু-পাঁচ টাকা দেবার সঙ্গতি আমার কি নেই?

—বড়বাবু! হঠাৎ রাখাল হাতির কণ্ঠস্বর। সে বাড়ি যাইতেছিল, রাস্তা হইতে বলিয়া গেল—আমি চললাম, বড়বাবু।

ক্ষেত্রনাথ একবার কাসিয়া চারিদিক তাকাইয়া বলিলেন—এখানটা ছিল পথ, তুমি পাল্কীর মধ্যে উঠে বসলে। কপালে সোনার সিঁথিপাটি ছিল—না?

—পথ ওদিকে। এটা বাইরের উঠোন। তুমি সমস্ত ভুলে গেছ বলিয়া একটু থামিয়া ম্লান হাসিয়া জগদ্ধাত্রী আবার বলিল—কতদিন পরে বাপের বাড়ি এসেছি পল্টুদা, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পরে—

ক্ষেত্রনাথ তাহারই কথার প্রতিধ্বনি করিলেন—গিয়েছিলে একরত্তি মেয়ে, ফিরে এলে কি রকম—

—তোমারও কি সে সব আছে? চুল পেকে গেছে, সামনের দাঁত নেই—

—তা হোক, তা হোক! ক্ষেত্রনাথ ব্যাকুল হইয়া সমস্ত যেন চাপা দিতে চাহেন। বলিলেন—তুই আর পল্টুদা বলে ডাকিসনে জগো

—ডাক শুনে চমকে উঠি—গা'র মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে যেন। মা মরার পর থেকে ও নাম ভুলে বসে আছি। আজকাল দশ গ্রামের লোকে আমায় মানে গণে—এর মধ্যে ছেলেবয়সের ঐ ডাক-নাম—না-না-না, ও বলে আর ডাকিস নে, বুঝলি ?

বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

হিমে সরিষা বন ভিজিয়া গিয়াছে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকিতেছে, চাঁদের আলো তীক্ষ্ণ ছুরির মত গাছপালা বিদীর্ণ করিয়া মাটিতে আসিয়া পড়িয়াছে। নিশুতি গ্রাম; চারিদিক কি মায়ায় থমকিয়া আছে। উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্ষেত্রনাথ ডাকিলেন—চলো যাই।

আবার সহসা বলিয়া উঠিলেন—আমার টাকাটার একটা কিনারা ক'রে দে জগদ্ধাত্রী, তোর বাপের ভিটে তোরই থাকুক। শুধু ঐ আশীটা টাকা দে—সুদ-টুদ আর চাইনে—সরষে-কলাই আঁব-কাঠালে যাই হোক কিছু ঘরে ত উঠেছে।

জগদ্ধাত্রী জবাব না দিয়া একটুখানি হাসিল। কয়েক পা গিয়া রাস্তায় পড়িয়া বলিল—ও সব মরুকগে—তুমি আমায় শুধু চারটে টাকা দিতে পার? দু'টাকা এই আসবার গরুর গাড়ি ভাড়া, আর দু-টাকা ফিরে যাবার।

—তার মানে শেষ কালে ত বলে বেড়াবি, জমিটা ফাঁকি দিয়ে নিলে। চিরকালের খোঁটা। ও সব আমি পারব টারব না বাপু—যা কিছু আছে তোমার, নিয়ে আমায় অব্যাহতি দাও—

নিঃশব্দে আরও কয়েক পা আসিয়া আবার ক্ষেত্রনাথ কথা কহিয়া উঠিলেন—টাকার দরকার থাকে,সিন্দুক বিক্রি কর—দিচ্ছি টাকা···এমনি কে কাকে টাকা দিয়ে থাকে ? সেই যে দেবীদাস রায়ের দরুণ সিন্দুক—সিন্দুক নয়, ক'খানা ভাঙা তক্তা। সেবারে লিখেছিলে, তাই নিয়ে এসে সেই অবধি টানাটানি করে মরছি। চার টার নয়, ঐ পুরোপুরি পাঁচই নিয়ে নিয়ো—ক্ষতি লোকসান যা হয় হোকগে, আর কি হবে—

বাড়ি ফিরিয়া ক্ষেত্রনাথ চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। খানিক পরে আভা পা ধুইবার জল দিয়া গেল ; তারপর আহ্নিকের আয়োজন করিতে আসিয়া দেখিল, জলচৌকীর উপর তিনি যেমন বসিয়াছিলেন তেমনই আছেন—যেন তাঁর সম্বিৎ হারাইয়া গিয়াছে। ক্ষেত্রনাথ বড় লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি জলের ঘটি টানিয়া লইলেন। বলিলেন—বৌমা, তোমার ছোট মাকে ডাকো দিকি একবার—

তরঙ্গিণী সামনে আসে না, সম্পর্কে বাধে; কবাটের ওধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

মুখখানা অতিশয় ম্লান করিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিতে লাগিলেন—সর্ব্বনাশ হয়েছে মা, বিষম সর্ব্বনাশ। সহায়রামের সরষে বন না ছেড়ে

আর উপায় নেই। গ্রামসুদ্ধ সব একজোট। মামলা করবে—আপোষে না দিলে হাজার টাকা খেসারত আদায় করবে—

—করুক গে। এতবড় ভয়ানক কথাটাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিয়া তরঙ্গিণী বলিল—আভা, বল তুই—ওসব ঠাকরুণ মিথ্যে করে ভয় দেখিয়েছেন। গ্রামের লোকের বয়ে গেছে—

গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—তা বলা যায় না—

—করে করুক। আমরাও দেখব শেষ অবধি। রায় দিয়া তরঙ্গিণী চলিয়া যাইতেছিল, ক্ষেত্রনাথ আবার ভয়ে ভয়ে বলিলেন—আবার তার সিন্দুক ফিরে চাচ্ছে—

তরঙ্গিণী এক মুহূর্ত্ত থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল—সিন্দুক-টিন্দুক নেই! আভা, বলে দে, সে ভেঙ্গে চুরে কবে উই-ইঁদুরের পেটে চলে গেছে—

—কিন্তু কাল যে নিতে আসবে, আমি স্বীকার ক'রে এসেছি।

—কাল? আসুক আগে সে, তখন দেখা যাবে—

দৃপ্ত ভঙ্গীতে তরঙ্গিণী চলিয়া গেল। ক্ষেত্রনাথ চুপ হইয়া গেলেন।

সিন্দুকের বৃত্তান্ত হৃদয়ও শুনিল। শুনিয়া নূতন করিয়া সে রুখিয়া উঠিল।

—আপনি নিশ্চয়ই হাতে-নাতে ধরে ফেলেছিলেন—না দিদি ?

জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া রহিল। হৃদয় বলিতে লাগিল—নইলে ও কি স্বীকার করে ? ও বুড়ো কি কম পাত্তোর ? ওটা আমার চাই। এই এক খানা জমি নিয়ে কতদিন আপনার পিছনে ঘুরলাম, কত পয়সা ব্যয় করলাম, সমস্ত গেল ফেঁসে।

ইহারও ভাল মন্দ কোন জবাব না পাইয়া আরও উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—পাঁচ টাকা কি—আমি দশ টাকা দেব, আমাকে দিন ঐ সিন্দুক। বাবাকে একদিন না-হক দশকথা শুনিয়ে চোখের সামনে দিয়ে হিড়-হিড় ক'রে ক্ষেত্তোর-দা ঐ সিন্দুক ঘরে তুলেছিল, ও-ই আবার আমি ওর ঘর থেকে টেনে বের করব। কড়ায় গণ্ডায় সমস্ত শোধ তুলব, তবে আমি বরদাকান্তর বেটা।

পরদিন জগদ্ধাত্রী আসিল। সঙ্গে হৃদয়। বলিল—সিন্দুকটা কি রকম আছে, দেখি একবার। ক্ষেত্রনাথ ঘরের মধ্যে গিয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া ভিতরের দিককার দরজা বন্ধ করিলেন, তার পর ঝনাৎ করিয়া চাবি ফেলিয়া নিস্পৃহ ভাবে তামাক খাইতে লাগিলেন। উমানাথ বালিশ-বিছানা সিন্দুকের উপর হইতে নামাইতে লাগিয়া গেল।

কড় কড়—কড়াৎ। প্রকাণ্ড লোহার তালা কতকাল মরিচা ধরিয়া আছে, গোড়ায় কিছুতে চাবি ঢোকে না; অনেক ঝাঁকাঝাঁকি

টানাটানি করিতে করিতে অবশেষে শিকলের মাথা ভাঙিয়া ঝুলিয়া পড়িল। উমানাথ ডালা তুলিল।

বিশ্রী ভাপ্‌সা গন্ধ। তারপর স্রোতের জলের মত আরশুলার ঝাঁক বাহির হইতে লাগিল। ভিতরটায় অতলস্পর্শী অন্ধকার।

হৃদয় উঁকি দিয়া বলিল—বাপ রে, তালপাতার আঁস্তাকুড়! ঝেঁটিয়ে ফেল—ঝেঁটিয়ে ফেল। ভিতরের ঐ দু-দিক, তলা-মাথা কেমন আছে, দেখি আগে—। বলিয়া ঝাঁটার অভাবে সে নিজেই দুই হাতে একবোঝা ঝপ করিয়া ফেলিয়া দিল, তারপর আর এক বোঝা। তালপাতার পুঁথি, পুঁথির উপর চিত্র-বিচিত্র কাঠের পাটা, ক'খানা তুলোট কাগজের পুঁথিও রহিয়াছে। হাতে পড়িতে সমস্ত টুকরা হইয়া মাটিতে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

—রোসো, রোসো, সব যে গেল। উমানাথ ব্যাকুল হইয়া তাড়াতাড়ি হৃদয়কে হটাইয়া দিল!

হৃদয় বলিল—রাগ কোরো না, একেবারে ফেলে দিই নি। তোমাদের উনুন ধরাতে কাজে লাগবে।

উমানাথ তখন মাটির উপরে ছড়ানো ছিন্নবিচ্ছিন্ন টুকরাগুলি সাজাইতে লাগিয়া গিয়াছে। হৃদয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল—এ সব সোনার গুঁড়ো হৃদয়, এ চিনবার ক্ষমতা তোমার নেই। এই সার্ব্বভৌমের পুঁথির স্বাদ নিতে দেশদেশান্তর থেকে কত কত পড়ুয়া ছুটে আসত—

সে কবি লোক। পূর্ব্বগামী মহাজনেরা তাঁহাদের অতি আদরের যে-কথাগুলি উত্তর পুরুষের জন্য যত্ন করিয়া পুঁথির পাতায় গাঁথিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে চক্ষু মুদিয়া ছিলেন তাহাদের এই অবহেলার বেদনা তাহার বুকে আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল। বলিল—এই খাতাগুলোয় রয়েছে সহায়রামের গান, ধানক্ষেতে চাষাভুষোর মুখে একদিন শুনে এসো! তারা ভুলে যায় নি।···কিন্তু এটা কি?

একখানি লম্বা আকারের খাতায় গোল গোল মোটা হরপে গঙ্গাস্তোত্র, দাতাকর্ণ এবং আরও কত কি উপাখ্যান। উমানাথ পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে জিজ্ঞাসা করিল—এটা আবার কার গান?

জগদ্ধাত্রী হাতে লইয়া দেখিয়া শুনিয়া খাতাটি নিজের কাছে রাখিয়া দিল।

—কি ওটা?

—বাজে।

উমানাথ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—দেবীদাস রায়ের সিন্দুকে সোনা থাকে—বাজে জিনিষ থাকে না দিদি, আপনি চিনতে পারেন নি। দিন আমাকে—দেখব। বলিয়া হাত বাড়াইল।

জগদ্ধাত্রী ঝাঁঝ দিয়া উঠিল—তা বই কি! আমার হাতের লেখার খাতা, আমি চিনি নে।

ক্ষেত্রনাথকে দেখাইয়া বলিল—এ ওঁর কীর্ত্তি। বলিতে লাগিল—মনে পড়ে পল্টুদা, এই খাতা আর শিশুবোধক তুমি চুরি করে এনে

দিয়েছিলে। এই তোমার হাতের লেখা—কি ধ্যাবড়া আর যাচ্ছেতাই ; আর এই আমার—কেমন মুক্তোর মতো দেখ দিকি···সকালবেলা উনি তিন-চার ছত্র করে লিখে দিয়ে যেতেন—পাঠশালে সমস্ত দিন ধরে যত মার খেতেন, বাড়ি এসে তার শোধ তুলতেন আমার উপর—সমস্ত দিন ধরে সেই ভয়ে বসে বসে দাগা বুলোতাম। কত কষ্টই যে দিয়েছ তুমি—

পুঁথিপত্র নামাইয়া সিন্দুক ক্রমশঃ খালি হইতে লাগিল। মাঝের তক্তা ভাঙিয়া গিয়াছে, সমস্ত জোড় আলগা হইয়া গিয়াছে, তলাটাও একদম নাই। দেখিয়া শুনিয়া হৃদয়ের প্রতিশোধের উষ্ণতাও ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিতে লাগিল। টাকা দিয়া এই বস্তু কিনিয়া বাড়ির পথেই ত অর্দ্ধেক গুঁড়া হইয়া যাইবে। বলিল—ইস, একদম গিয়েছে যে।

জগদ্ধাত্রীও বুঝিল, ইহা কায়দায় ফেলাইয়া দাম কমাইবার চেষ্টা। সভয়ে কহিল—নেবে না নাকি? না-ই যদি নেবে এই টানা-হেঁচড়ার দরকার ছিল কি?

হৃদয় বলিতে লাগিল—নেব না বলছে কে? কিন্তু আগে ত জানতাম না, এই দশা। দশ টাকা আমি দিতে পারব না।

ক্ষেত্রনাথ কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তার আগেই উমানাথ বলিয়া উঠিল—আমি রাখব দিদি, আমি দশ টাকা দেব। সরুন, পুঁথিপত্তর তুলে ফেলি, গানের খাতা তুলে ফেলি—বলিয়া সহায়-

রামের গানের খাতা কপালে ঠেকাইয়া সে সিন্দুকে তুলিল। বলিতে লাগিল—বরাতক্রমে ঘরে এসেছে এমন সিন্দুক ত জীবন থাকতে ছাড়ছি নে। দশ টাকা চান, তাই দেওয়া যাবে। সরো হৃদয়, তোমার পিছনে আরও যে কি কি সব রয়েছে···

সমস্ত সাজাইয়া তুলিয়া উমানাথ সিন্দুকের ডালা বন্ধ করিল। ক্ষেত্রনাথের দিকে তাকাইয়া দেখিল, তিনি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছেন। তারপর জগদ্ধাত্রীর হাতের দিকে নজর পড়িতে বলিল—ওটা আবার কি —সেই হাতের লেখার খাতা ?

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বলিল—এটা ত বিক্রী করিনি—আচ্ছা, কত টাকা দিতে পার এটার দাম ? এক পয়সাও না ? তাই বই কি ! লাখ টাকা—বুঝলে, তারও বেশী। তারপর বলিল—যা-ই হোক দশটা টাকা কালকে দিয়ে দিও উমানাথ, খুব সকালে রওনা হয়ে যাব। হৃদয়, লক্ষী ভাই, আজ বিকেলের দিকে একটা গরুর গাড়ী ঠিক করে রেখো—

হৃদয় বিরক্ত কণ্ঠে বলিল—আমি পারব না। ক'দিন ধরে এই ক'রে ক'রে কাজকর্ম্ম হচ্ছে না কিছু। আজ আমার আদায়ে বেরুতে হবে। আপনি আর কাউকে বলুন।

ক্ষেত্রনাথ এতক্ষণ সকলের পিছনে নির্ব্বাক পাথরের মত দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিলেন তিনিই জানেন, এইবার কথা কহিয়া উঠিলেন। বলিলেন—তুমি ভেবো না জগো,গাড়ী আমি ঠিক করে দেব। আর এত

বেলায় হৃদয়ের বাড়ি অদ্দুর নাই গেলে। তরঙ্গিনীর আপ্যায়নের কথা ভাবিয়া একবার একটু ইতস্তত করিলেন, তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন—আজ থাকো আমার বাড়ি, কাল এখান থেকে অমনি চলে যেও। হৃদয় বরঞ্চ একসময় কাউকে দিয়ে তোমার জিনিষপত্তোর যা আছে পাঠিয়ে দেবে।

—তা দেব—বলিয়া ব্যঙ্গভরা হাসি হাসিয়া হৃদয় বলিল—অঢেল জিনিষপত্তোর! ফুটো ঘটি আর খান দুই কাঁথা—দেব পাঠিয়ে বিকেল বেলা।

সকলে চলিয়া গেল, রহিলেন কেবল ক্ষেত্রনাথ ও জগদ্ধাত্রী। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—জগো, দিয়ে দে আমার আশী টাকা, আমি তোর জিনিষপত্তোর, বাপের ভিটে—সমস্ত ছেড়ে দিচ্ছি। আমি ত বাঁচি তা হলে।

জগদ্ধাত্রী হাসিল।

—না পারিস্ টাকা দিস্ এর পর। সত্যি তুই চাস্?

জগদ্ধাত্রী একটু চুপ থাকিয়া বলিল—ও তোমারই থাক। তুমি বরঞ্চ মাঝে মাঝে দু-এক টাকা ক'রে পাঠিয়ে দিও আমায়। জায়গা জমি ত পেটে খাওয়া যায় না।

পরদিন খুব ভোরে গরুর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। মেজবউ ছোটবউ অনেক আগেই উঠিয়াছে। বলিল—ভুলে যাবেন না মা, আসবেন আবার!

আঁচলের প্রান্তে চোখ মুছিয়া জগদ্ধাত্রী বলিল—সোনার রাজ্যি তোদের মা, ছেড়ে যেতে মন আমার চাচ্ছে না।

ক্ষেত্রনাথ আসিয়া ডাকিলেন—শোনো—

তাহাকে একান্তে ডাকিয়া পাঁচটি টাকা হাতে দিলেন। বলিলেন—সিন্দুকের দাম।

জগদ্ধাত্রী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—এ কি? দশ টাকার কথা ছিল যে। উমানাথ কোথায়?

—সে ত তার পর থেকেই নিরুদ্দেশ। মঠবাড়িতে গেছে, সেখানেই মালসাভোগ হচ্ছে আর কি। তার কথায় কি হবে? দরদস্তুরের সে জানে কি? নেহাৎ ব'লে ফেলেছে ব'লেই, নইলে ভাঙা সিন্দুক আর কি কাজে লাগবে বলো? ইচ্ছে হ'লে তোমার জিনিষ নিয়ে যেতে পার।

জগদ্ধাত্রী ভাবিতে লাগিল।

ক্ষেত্রনাথ প্রশ্ন করিল—কি বলো? যাবে নিয়ে? ঐ রকম বেকায়দা জিনিস গরুর গাড়ীতে যাবে বলে ত বোধ হয় না, অন্য রকম ব্যবস্থা করতে হয় তা'হলে। খরচও ঢের—

জগদ্ধাত্রী বলিল—দাও, ও-ই দাও—তোমার যা খুশী।…আসা-

যাওয়ার. ভাড়া গেল চার—হাতে থাকল এক টাকা। তাই ভাল। বলিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া হাত পাতিল।

ক্ষেত্রনাথ টাকা দিয়া একটু ওদিকে যাইতে আভা পুনশ্চ আগাইয়া আসিয়া সসঙ্কোচে বলিল—মা, ছোঁব আপনাকে ?

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বলিল—মুচির মেয়ে নাকি তুই যে ছুঁলে জাত যাবে ?

নত হইয়া সে জগদ্ধাত্রীকে প্রণাম করিল। বলিল—সকাল-বেলা নেয়ে-টেয়ে নিয়েছেন কিনা···তাই বলছিলাম। আপনার পায়ের ধূলো নি একটু যাবার বেলা—

জগদ্ধাত্রী ছোট মেয়ের মত তাহাকে জড়াইয়া কোলে তুলিয়া লইল। অশ্রু আর বাধা মানিল না, ঝরঝর করিয়া গাল বহিয়া ঝরিতে লাগিল। চিবুকে আঙুল ছোঁয়াইয়া আঙুলের অগ্রভাগ চুম্বন করিয়া বলিল—রাজরাণী মা তুই আমার—পোড়াকপালীর পায়ে হাত তুই কেন দিবি মা? কেন দিবি, কেন?···আচ্ছা, যাই তবে। তোর শাশুড়ী এখনও ঘুমুচ্ছেন বুঝি। নিতাই কোথায় রে—ঘুমুচ্ছে ?

—হুঁ—

—আচ্ছা, চল্লাম। ও পন্টুদা—ক্ষেত্রনাথ মুখ ফিরাইতে জগদ্ধাত্রী বলিল—আচ্ছা, সেই যে গাড়ীটা—মেলার সেই রেলগাড়ী—দাম ঠিক ঠিক কত নেবে বলো ত—

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—বলে ত পাঁচসিকে। এক টাকার কম দেবে না বোধহয়—

—এই টাকাটা দিয়ে নিতুকে ওটা কিনে দিও। বলিয়া আঁচলের প্রান্ত হইতে ক্ষেত্রনাথের দেওয়া পাঁচ টাকার একটি টাকা বাহির করিয়া বাঁধানো বোধন-পিড়ির উপর রাখিল। আবার হাসিয়া বলিল—গরুর গাড়ীর চার আর রেলের গাড়ীর এক। লাভে রইল আমার খাতাখানা—তবু বাপের বাড়ির একটা জিনিষ—

জীর্ণ মটকার থানের আঁচলে সেই কীটদষ্ট বহু পুরাতন দাগাবুলানো হাতের লেখার খাতাখানা যত্ন করিয়া জড়াইয়া লইয়া জগদ্ধাত্রী গাড়ীতে গিয়া বসিল।

ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ করিয়া আর্তনাদ করিতে করিতে অসমান গ্রাম্য রাস্তার উপর দিয়া গরুর গাড়ী চলিয়াছে। চলিতে চলিতে হঠাৎ কি রকমে গরুর কাঁধের ফাঁস খুলিয়া গিয়া গাড়ী একটুখানি থামিল। অল্পদূরেই সহায়রাম রায়ের পরিত্যক্ত ভিটার উপর শিশির-স্নাত হলুদ-বরণ সরিষা-ফুলের সমুদ্র। প্রভাতের শান্ত নিস্তব্ধ গ্রাম। চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্ষেত্রনাথ দেখিতেছিলেন। হঠাৎ কি মনে হইল, বাক্স হইতে আরও পাঁচটি টাকা লইলেন। এক মুহূর্ত ইতস্তত

করিলেন, তারপর গাড়ীর পিছে পিছে এক রকম ছুটিয়া গিয়া ডাকিয়া থামাইয়া টাকা কয়টি জগদ্ধাত্রীর হাতে দিলেন।

—এই নাও। হ'ল ত? ঘর সারাতে হয়, যা করতে হয়, কর গিয়ে—আমি আর কিছু জানি নে। যেন একজন কাহার উপর বড় অভিমান করিয়া বিদায় হইয়া যাইতেছে—নিজের মান বজায় রাখিতে হইবে, তাহাকেও ঠাণ্ডা করিতে হইবে এমনি একটা ভাব। ক্ষেত্রনাথ বলিতে লাগিলেন—ভায়া আমার বেশ মানুষ। দশ টাকা হুকুম ক'রে নিজে ত গা ঢাকা দিয়েছেন, এখন মর শালা তুই টাকার জোগাড় করে।

অপর পক্ষ অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া আছে দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ গাড়োয়ানের উপরেই হাঁক দিলেন—চালা, চালা—বেলা বাড়ছে না? থেমে রইলি কেন?

জগদ্ধাত্রী বলিল— আর কতদূর যাবে পন্টু দা, ফেরো এবার—

—তাইত? বলিয়া ক্ষেত্রনাথ চমকিয়া মুখ তুলিলেন। তারপর হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন— না হয় যাবো তোর বাড়ি অবধি। —একটা দু'টা দিন খেতে দিবিনে?

—উঠে এসো, গাড়ীতে জায়গা আছে ঢের। বলিয়া গাড়োয়ানকে বলিয়া জগদ্ধাত্রী গাড়ী দাঁড় করাইল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—

তুমি যাবে আমার বাড়ী ? হা রে আমার কপাল। সেই জঙ্গলরাজ্যের মধ্যে যাবে আনন্দের হাট ফেলে ?

ক্ষেত্রনাথ নিরাপত্তিতে গাড়ীতে উঠিলেন, আবার গাড়ী চলিতে লাগিল। সামনে ধূলা উড়াইয়া আর একটা গরুর গাড়ী চলিতেছে। জগদ্ধাত্রী পুনশ্চ প্রশ্ন করিল—সত্যি, চল্লে কোথায় ? এদিকে তাগাদা-পত্তোর আছে বুঝি ?

সে কথায় কান না দিয়া হঠাৎ ক্ষেত্রনাথ উচ্ছ্বসিত গলায় হাসিয়া উঠিলেন। মনে হইল, কতকাল—কতকাল পরে গলার উপর হইতে কিসের একটা বাঁধন খসিয়া গিয়াছে—বুক ভরিয়া ক্ষেত্রনাথ হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন—দেখো দেখো—ঐ গাড়ীর ওরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। কি ভাবছে বলো ত ?

জগদ্ধাত্রীর মুখেও মৃদু হাসির আভা খেলিয়া গেল। বলিল—কি ভাবছে ওরাই জানে—

—আচ্ছা, এই যদি বিশ-পঞ্চাশ বছর আগে হ'ত—এমনি ভাবে যেতাম—লোকে ঠিক হাসা-হাসি করত,—না ? কি ভাবত বল দিকি—

জগদ্ধাত্রী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল— তা হাসত। ভাবত, তোমার ঠ্যাং ভেঙেছে। পায়ে বল থাকতে সখ করে কেউ কি আর গরুর গাড়ীতে চড়ে ?

—তোমার মুণ্ডু।

—তবে ?

—সেই সময় এদেশ-সেদেশ কত কি রটে গিয়েছিল, মনে আছে ?

জগদ্ধাত্রী ভালমানুষের মত সায় দিল—তা আছে। একবার রটেছিল, পানে পোকা। হাজার হাজার মানুষ নাকি পান খেয়ে মরে গেছে। গাঁয়ের কেউ আর পান খায় না। বারুইরা বাবার কাছে এসে কাঁদে—গোছা গোছা পান দিয়ে যাচ্ছে পয়সা লাগবে না—বারোয়ারীর চাঁদা যা ধরবে তাই-ই দেবো—তোমরা একবার একটা পান মুখে দিয়ে দেখ।

অধীর কণ্ঠে ক্ষেত্রনাথ বলিয়া উঠিলেন—তুমি গাধা।

জগদ্ধাত্রী বলিল—তুমি নাম দিকি—শিগগির বাড়ী থেকে নেমে যাও। আমার ভয় করছে ; গালাগালির পরে আবার হয়ত সেইরকম ঠেঙানি সুরু হবে—

ক্ষেত্রনাথ সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন— হবেই ত। তুই সমস্ত ভুলে যাস। কথা উঠেছিল না, আমাদের বিয়ে হবে ?

জগদ্ধাত্রী ভাবিবার ভাণ করিয়া বলিল—তা হবে হয়ত। কত সম্বন্ধ হয়েছিল, সব কি মনে থাকে ?

—মনে থাকে না ? মাথায় তোর গোবর-পোরা—তাই মনে থাকে না। হঠাৎ মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, মিটি-মিটি হাসি। বলিলেন—সমস্ত মনে আছে তোমার। দুষ্টুমি হচ্ছে। চিরকাল জানি তোমাকে। তবে শোন্ একটা কথা—

ক্ষেত্রনাথ অকারণে চারিদিকে একবার তাকাইয়া দেখিয়া গলা নীচু করিয়া বলিতে লাগিলেন—কেউ জানে না, কোন দিন কাউকে বলিনি। যেদিন তোকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে গেল, আমি কেঁদেছিলাম। বাঁশঝাড়টার ঐখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, তোর পাল্কী খেয়ায় তুলল, কি রকম হয়ে গেল মনটা—খানিক পরে আপনি চোখে জল গড়িয়ে এলো। ঐখানে উপুড় হয়ে পড়ে কত কাঁদলাম—

শ্রোতার মুখের হাসি নিবিয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত চুপ থাকিয়া গম্ভীর বিরক্ত কণ্ঠে জগদ্ধাত্রী বলিল—তুমি এই শোনাতে গাড়িতে উঠে এলে নাকি? তিন কাল কেটে গেছে, একজন বিধবা মানুষের সামনে ঐ সব বলতে মুখে বাধে না?

ক্ষেত্রনাথ ঘাবড়াইয়া গেলেন। ভারী লজ্জা হইল। সহসা কথা জোগাইয়া উঠিল না। বলিলেন—লজ্জা নয়···হাসির কথা শুধু একটা হাসির কথা জগো, একটা সেকেলে কথা। কত কথাই ত মানুষে বলে—

জগদ্ধাত্রীর চোখে এক ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিল। অলক্ষ্যে মুছিয়া ফেলিয়া সে বলিয়া উঠিল—হোক কথা। আমি এক্ষুনি গ্রামে ফিরে তোমার সমস্ত কীর্ত্তি রাষ্ট্র ক'রে দেব।

কণ্ঠস্বরে কৌতুকের আভাস পাইয়া ক্ষেত্রনাথ মুখের দিকে তাকাইলেন, চোখ দুটি তার ছল-ছল করিতেছে। হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—তা দিগে যা। তখনকার মানুষ কে আছে,আর কে-ই

বা বুঝবে ? এক্ষুনি আনন্দের হাটের কথা বলছিলি না জগো, —আমাদের এখন ভাঙা হাট, আমাদের হাটের মেলা ঐ জমছে ঐদিকে।

বলিয়া আকাশের দিকে নির্দেশ করিয়া হঠাৎ চুপ হইয়া গেলেন।

নদীর তীরে খেয়াঘাটে আসিয়া গাড়ী থামিল। মঠবাড়ি এখান হইতে বেশী পথ নয়, সেখানে এখনও প্রবল খোলের আওয়াজ। খেয়ানৌকা ঘাটে পড়িয়া আছে, কিন্তু মাঝি নিরুদ্দেশ। জমার খেয়া নয়, অতএব ইহা নৈমিত্তিক ঘটনা। পারার্থীরা আসিয়া মাঝির ঘরের দরজায় ধন্না দিয়া পড়ে, মেজাজ যেদিন তার ভাল থাকে ঘণ্টা খানেকের বেশী ডাকাডাকি করিতে হয় না। গাড়োয়ান মাঝির খোঁজে চলিয়া গেল। দু'জনে নামিয়া খেয়াঘাটের কিনারে গিয়া বসিল।

শীতের নদীজলে ধোঁয়ার মত কুয়াসা উড়িতেছে। তখন ভরা জোয়ার ; কল-কল বেগে জল ছুটিয়া আসিয়া পাড়ের উপর প্রহৃত হইতেছে। একটু দূরে মহাকালের মত মহাবৃদ্ধ একটি অশ্বত্থ গাছ শত সহস্র ঝুরি নামাইয়া অনেক খানি জায়গা জাপটাইয়া বসিয়া আছে। আগের গরুর গাড়ীখানাও গাছের তলায় আনিয়া রাখিয়াছে। ছইএর মধ্যে ফুটফুটে একটি বউ, বউটির মুখের উপর অশ্রুর ছাপ। বাহিরে চালার উপর সুন্দর একটি যুবা বধূর মুখের কাছে মুখ লইয়া

হাত মুখ নাড়িয়া নাড়িয়া কত কি বলিতেছে। অশ্রু-চোখে বউটি হাসিয়া উঠিল।

দু'জনে সেই তরুণ তরুণীকে দেখিল, কুয়াসাচ্ছন্ন নদীস্রোতের দিকে দেখিল, চারিদিকের নিস্তব্ধ প্রান্তর পথ-ঘাটের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ ক্ষেত্রনাথ বলিয়া উঠিলেন—দশা তোরও যা, আমারও তাই। আমারও কেউ নেই—তোরও না।

জগদ্ধাত্রী গাঢ় স্বরে বলিল—ওরা কেউ যত্ন করে না বুঝি?

ক্ষেত্রনাথ ঘাড় নড়িয়া বলিলেন—মানুষের দোষ নয় রে, বয়সের দোষ। কিন্তু সে যাক, তুই রাগিস নি ত? বল্ জগো, সত্যি করে বল্—

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বলিল—না। আমি কি সেই জগদ্ধাত্রী আছি না তুমি সেই পল্টু দা? আমরা দুই বুড়োবুড়ী আর ক'দের গল্প বলছিলাম।

দু'জনেই হাসিতে লাগিল।

গাড়োয়ান ফিরিয়া খবর দিল, মাঝি বাড়িতেও নাই—রাত্রে মঠবাড়িতে গান শুনিতে গিয়াছিল, এখনও ফিরে নাই।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—আমি যাই—বেটাকে তাড়া না দিলে কি উঠবে?

জগদ্ধাত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল।

—তুইও যাবি নাকি ?

মঠবাড়িতে গান তখন বড় জমিয়াছে। অষ্টপ্রহর সঙ্কীর্ত্তন, শেষরাত্রি হইতে গান জুড়িয়াছে। কাল বালক সঙ্কীর্ত্তনের দল আসিয়া পড়িয়াছে, কালও সমস্ত দিন গান হইয়াছে, সেই জন্য উমানাথের আর বাড়ি যাওয়া হয় নাই। জগদ্ধাত্রী চলিয়া যাইবে তাহা মনে ছিল, তবু যাইতে পারে নাই। অনেকক্ষণ অবধি চুপ করিয়া গান শুনিয়া, তারপর সে থাকিতে পারে নাই, নিজেই দলের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। গান ভাঙিতে বেলা গড়াইয়া গেল, তখন আর বাড়ি-ঘরের কথা উমানাথের মনে নাই। বৈষ্ণব-সেবার ডাক আসিল, উমানাথ তখনও মনে মনে সুর ভাঁজিতেছে।

সেই প্রথম দিনের দলটির কর্ত্তা আসিয়া মনে করাইয়া দিল—ছোট চাটুজ্জে মশায়, মনে আছে ত আমাদের মাথুর পালাটা ঠিক ক'রে দেবার কথা ?

কীর্ত্তনীয়াদের থাকিবার জন্য খড়ে ছাওয়া প্রকাণ্ড মণ্ডপ। তাহার একদিকে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। কেরোসিনের ডিবাটা সরাইয়া লইয়া উমানাথ সেখানে বসিল। খেরো-বাঁধা খাতা বাহির হইল, আর বাহির হইল সহায়রামের পুরাণো গানের খাতা—

াসে রায়ের সিন্দুকে যাহা পাওয়া গিয়াছে। খাতার সঙ্গে দড়ি দিয়া
বাঁধা পেন্সিল থাকিত।

গুণগুণ করিয়া গাহিতে গাহিতে উমানাথ পালা লেখা শেষ করিল।
ত্রই খানিক তালিম দেওয়া হইয়াছে, সকাল হইতে সেই পালা
লতেছিল—

বৃন্দা বলিতেছে—ওগো অকরুণ শ্যাম, তোমার বিরহে বৃন্দারণ্য
শান হইয়াছে, তোমার পথ চাহিতে চাহিতে গোপীরা অন্ধ
য়া গেছে, তোমার সোহাগিনী রাই শীর্ণ চতুর্দ্দশী-চাঁদ হইয়া
গায় পড়িয়া রহিয়াছে, প্রাণের স্পন্দনটুকু তাহার বুঝি এতদিনে
ঃশেষে থামিয়া গেল···

সহসা শ্রোতারা চাহিয়া দেখিল, ক্ষেত্রনাথ চাটুজ্জে মহাশয়
াশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিয়া অবশেষে সকলের মধ্যে বসিয়া
তছেন। জগদ্ধাত্রীও মেয়েদের মধ্যে বসিয়াছে ।

তখন দূতীকে কৃষ্ণ অভয় দিতেছেন—ভয় করিও না সখি বৃন্দা,
মি ফিরিয়া যাইতেছি। আমার রাইকমল আমার কৈশোরের
ই বৃন্দাবন—কিছুই মরে নাই। আবার আমি ফিরিয়া যাইব,
ান কুসুম শতদল হইয়া ফুটিয়া উঠিবে···

…পীত ধড়া পরিয়া হাতে মুরলী হইয়া মথুরার রাজা কতকাল— কতযুগ পরে আবার রাখাল বেশে কৈশোরের বৃন্দাবনে চলিলেন। আকাশে চাঁদ উঠিল, যমুনা উজান বহিতে লাগিল, হারাণো দিনের বাঁশীর ধ্বনি আবার গোকুল-বৃন্দাবন আকুল করিয়া বাজিতে লাগিল।…দুরন্ত কালার ভয়ে ভূমিশয্যা ছাড়িয়া চকিতে শ্রীমতী মুখ ঝাঁপিয়া বসিলেন। আঁচল ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে কৃষ্ণ কত কি কহিতেছেন। কুঞ্জবৃক্ষের শাখাগ্রে কোকিল ডাকিতে লাগিল …

সজল চোখে জগদ্ধাত্রী ক্ষেত্রনাথের দিকে চাহিল। ক্ষেত্রনাথও তাকাইলেন। সবিস্ময়ে সকলে দেখিল, ক্ষেত্রনাথের চোখে জল। গান শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ কাঁদিয়া ফেলিবেন, অতিবড় শত্রুও এমন অপবাদ দিবে না। হয়ত চোখের অসুখ, হয়ত চোখে খড়-কুটা পড়িয়াছে…

Composed at **The New Press**, 4B, Bijoy Mukherjee Lane, Bhowanipur, & Printed by B. Chatterjee, at Kalitara Press, 16, Townshend Road, Bhowanipur, Calcutta.